কিশোর বিস্ময়

জুলাই ৮৪

কিশোর বিস্ময়

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর বিস্ময় প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২'৫০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা ২৫ টাকা। গ্রাহকদের জন্য শারদসংখ্যার অর্ধমূল্য।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। বুক পোস্টে গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- এম, ও. বা সরাসরি নগদ পাঠাতে হবে কিশোর বিস্ময়ের নামে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাকমাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যাপিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

প্রচারসম্পাদক : কিশোর বিস্ময়
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

কিশোর বিস্ময়

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা জুলাই : ১৯৮৪

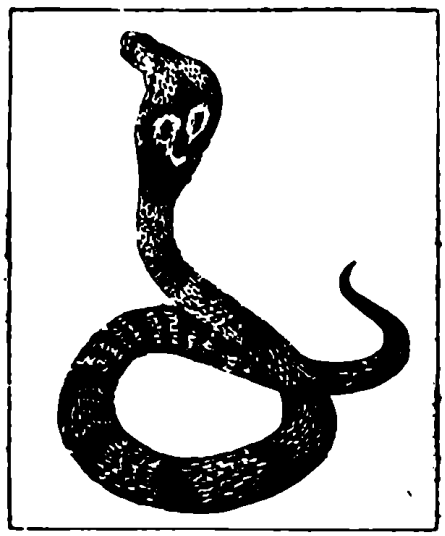

□ সম্পাদক □

অনীশ দেব

□ নির্বাহী সম্পাদক □

অশোক রায়

নামাঙ্কণ □ বিমল দাস

প্রচ্ছদ □ কুমারঅজিত

অলঙ্করণ □ সুশান্ত বিশ্বাস

□ সম্পাদকীয় কার্য্যালয় □

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

অশোক কুমার রায় কর্তৃক কিশোর বিস্ময়ের পক্ষে ১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎ-কর্তৃক অনুরাধা প্রেস, ১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

□ সূচিপত্র □□□□□□

ধারাবাহিক উপন্যাস

৪৪ সময় পর্যটক টারজন □ অদ্রীশ বর্ধন

বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প

৬ কলকাতায় প্রচণ্ড তুষারপাত □ শেখর বসু

১৯ ভুতুরে গাছ □ শংকর ঘটক

বিজ্ঞান ছড়া

৫ জলবিদ্যুৎ □ বীরেশ ঘটক

আজও রহস্য

১৭ পিরামিড রহস্য □ রাহুল রায় ও পার্থ দত্ত

ছবিতে কাহিনী ও সচিত্র বিস্ময়

১২ আইনষ্টাইন ৪৮ ভয়ংকর যাত্রা ১৪ বিশ্বের বিস্ময়

১১ বিস্ময়ের নোট বই ৪৭ আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

বিশেষ ক্রোড়পত্র : সাপ

২৪ সাপ □ সুমন্ত্র সারথি

২৯ সাপের চরিত্র □ সৌরেন দত্ত

৩২ বিচিত্র সাপ □ রীতা দত্ত

৩৮ ক্রোড়পত্র কুইজ □ দেবাশীষ সেনগুপ্ত

জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা

৪৯ শহীদ মিনার ও সপ্তর্ষি মণ্ডল □ অরূপরতন ভট্টাচার্য

১৭ যে ঘর চলে বেড়ায় □ ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

৪৪ দুর্ঘটনায় বিস্ময়কর আবিষ্কার □ অশোক রায়

বিজ্ঞানের ভেলকি

৫৯ নিমেষে যোগফল □ মার্টিন গার্ডনার অবলম্বনে □ অশোক রায়

নিয়মিত বিভাগ

৪ বিজ্ঞান সংবাদ □ সব্যসাচী সেনশর্মা

৫৩ শব্দছক □ দেবব্রত রায় চৌধুরী

গোয়েন্দা মাছি

কে আছে খুনের সাক্ষী? ছড়ায় বলতে গেলে, দেখেছে মাছির অক্ষি! ইদানীং আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটপতঙ্গ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বার্ণাড গ্রীনবার্গও বলছেন একই কথা : খুনীকে ধরতে মাছির সাহায্য নিন।

গ্রীনবার্গের মতে, 'খুনের অকুস্থলে মাছিই সবার আগে আসে। তারা একমাইল দূর থেকেও মৃতদেহের গন্ধ পায়। তখন স্ত্রী-মাছিরা এসে মৃতদেহের ওপরে ডিম পাড়ে।' এই মাছির জাত দেখে অর্থাৎ তারা শহরের না গাঁয়ের—বলা যাবে, খুনটা কোথায় হয়েছে, শহরে, না গ্রামে। গ্রীনবার্গ আরও বলছেন, যদি শহরে মৃতদেহের গায়ে গ্রামের মাছি পাওয়া যায় তাহলে বলা যাবে, মৃতদেহ খুনের জায়গা থেকে সরানো হয়েছে।' গ্রীনবার্গের কথা মতো এ-পর্যন্ত দশ দশটা খুনের সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

এ ছাড়াও গ্রীনবার্গ আরও কিছু সূত্রের হদিশ পেয়েছেন। মাছির শুক কীটের অবস্থা দেখে বোঝা যাবে, স্ত্রীমাছি ঠিক কখন ডিম পেড়েছিলো মৃতদেহের গায়ে। অর্থাৎ, কখন সে খুঁজে পেয়েছিলো মৃতদেহটি। গরম আবহাওয়ায় শুককীট তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঠিক তার উলটো। সুতরাং শুককীটের বেড়ে ওঠার হার আর আবহাওয়ার খবর মিলিয়ে গ্রীনবার্গ খুনের সময়টাও বলে দিতে পারছেন।

একটা ঘটনায় গ্রীনবার্গ শুধু শুককীটের ফটো পেয়েছিলেন। ফটোতে দেখা যাচ্ছে মৃতদেহের ওপরে শুককীট কিলবিল করছে।

শুধু এর ওপরে নির্ভর করে তার সঙ্গে আবহাওয়ার খবর যোগ করে গ্রীনবার্গ খুনের সময় আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে বেঁধে দিতে পেরেছেন। এতে দুজনকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

তুমি কি জানো?

তোমার ফুসফুসের ক্ষেত্রফল কত তা তুমিই হয়তো জানোনা! প্রায় একটা টেনিসকোর্টের মাপের সমান। ৩০০ কোটি ক্যাপিলারি টিউব ফুসফুসের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। শুনলে চোখ কপালে উঠবে—এই ক্যাপিলারিগুলো যদি লম্বা করা যায় তাহলে তার দৈর্ঘ্য পৌঁছে যাবে ১৫০০ মাইলে।

সবচেয়ে নমনীয় সোনা

সোনা হচ্ছে সবচেয়ে নমনীয় পদার্থ। সোনাকে পিটিয়ে যথেচ্ছভাবে সরু তার প্রস্তুত করা যায়। শুনলে অবাক হবে এক আউন্স সোনা পিটিয়ে ৪৩ মাইল দীর্ঘ সরু তার তৈরী করা যায়।

নতুন বেবিফুড

মহীশূরের সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটুট নতুন এক দুধের ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন যা কিনা মাতৃদুধের সমতুল্য। বাজারের অন্যান্য বেবিফুড-এর চাইতে অনেক কম প্রোটিন আছে এই দুধে। মাতৃদুধের প্রোটিন থাকে প্রায় ১০ শতাংশর মত। সেখানে বাজারে চালু বেবিফুড বর্তমানে আছে ২২ শতাংশ প্রোটিন। কিন্তু এই নতুন দুধে পাওয়া যাবে মাত্র ১২ শতাংশ প্রোটিন, যা কিনা প্রায় মাতৃদুধের প্রোটিনের কাছাকাছি। নতুন দুধে সম পরিমাণ ফ্যাটি অ্যাসিডও আছে। ইতিমধ্যে এই দুধ মহীশূরের এক হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য খাওয়ানো হয়েছে এবং পরীক্ষার ফলও হয়েছে আশানুরূপ।

□ সব্যসাচী সেনশর্মা

বৈদ্যবাটির আঢ্যবাবুর ইলেকট্রনিক মাথা
বুকপকেটে গুঁজে রাখেন হরেকরকম খাতা
সকাল সন্ধে দাঁড়িয়ে বসে
কিলো মেগার হিসেব কষে
ঝাঁ ঝাঁ রোদে বার দুই তিন ঘুরিয়ে নেন যাঁতা।

রাজ্য জুড়ে চলছে দেখে ব্যাপক বিজলী ছাঁটাই
পুকুর পাড়ে বিছিয়ে দেন মস্ত বড় চাটাই
সাতঘড়া জল যাঁতায় পিষে
তার সঙ্গে হাওয়া মিশে
জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে খুলে দেখান খাতা-ই।

ছোট বড় সব কাগজেই বিশাল বড় হেডিং
ধন্য ধন্য আঢ্যবাবু, অভিনব অ্যাডিং।
জ্বলে যখন উঠল আলো
সবই দেখায় নিকষ কালো
নামল আঢ্যবাবুর মুখে মিশ কালো লোডশেডিং।

গত সংখ্যার আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের উত্তর

সেলাইকল আবিষ্কার করেন ইলিয়াস হো, ১৮৪৬ সালে।

সঠিক উত্তর দাতা □ তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর—১০
□ অরুণ আদিত্য, কলিকাতা—১১
□ সুমিত রায়, কলিকাতা—৯

গত সংখ্যার খুঁজে বার করো'র উত্তর

১। আফ্রিকান হাতি। ২। ক্যাঙ্গারু ৩। পোলার ভালুক। ৪। রেকুন। ৫। গোরিলা।
৬। বাঘ। ৭। হরিণ। ৮। সিংহ ৯। সিন্ধুঘোটক। ১০। জিরাফ।
১১। পাণ্ডা। ১২। আর্মাডিলো ১৩। ভারতের হাতি। ১৪। ব্যাকটিরিয়ান উট।

বিজ্ঞান সুবাসিত বড় গল্প

কলকাতায় প্রচণ্ড তুষারপাত

শেখর বসু

পরশু রাত্রে মৃদু ভূমিকম্প হওয়ার পরেই জোর বৃষ্টি নেমেছিল, সঙ্গে কনকনে ঝোড়ো হাওয়া। সেই বৃষ্টি থেমেছে আজ সকালে। বৃষ্টির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। ঝোড়ো হাওয়াও আর লাফিয়ে পড়ছে না বন্ধ জানলার ওপর। দেয়ালঘড়িতে ঢং-ঢং করে সাতটা বাজল। কিন্তু অনুদের বাড়ির ভেতরটা মাঝরাত্তিরের মতো হয়ে আছে। ঘুম ভেঙে গেছে সবারই, কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে না কেউ। প্রচণ্ড শীতে লেপ-কম্বলের তলাতেও প্রত্যেকের গা-হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছিল।

পরশু রাতে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর থেকেই ঠাণ্ডা কেমন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। তারপর সেই লাফানো আর থামেনি। কলকাতার শীত আরামের শীত, পাতলা একটা লেপ গায়ে থাকলেই দিব্যি রাত কেটে যায়। কিন্তু সেই শীত লাফিয়ে লাফিয়ে এত বেড়ে গেছে যে, অনুদের বাড়ির যাবতীয় লেপ কম্বল মস্ত একটা পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে বিছানায়। সেই পাহাড়ের নীচে ঢুকেও শীতের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়নি। তখন আলমারি খালি করে সমস্ত গরম জামা কাপড় নামানো হল। তারপর সেগুলো পরে নিয়ে লেপ-কম্বলের পাহাড়ের নীচে ঢুকে পড়ল এ বাড়ির চারটি প্রাণী। তবু শীত, হাড়কাঁপানো শীত। মনে হচ্ছিল, কে যেন লেপ কম্বল আর গরম জামায় কয়েক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে।

অনুর বাবা দাঁত ঠকঠক করতে করতে বললেন, 'কলকাতায় এত শীত! এ তো জীবনেও দেখিনি।'

একটু বাদে অনুর মা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'উ-নু-ন। ঘরের মধ্যে একটা উনুন জ্বালাতে পারলে—।'

জবাবে পনেরো বছরের ছেলে অনু বলল, 'উনুন তো ছাতে।'

ছোট্ট এই জবাবটাতেই ঘরের বাকি তিনজন বুঝে গেল অনু কী বলতে চাইছে। হাড়কাঁপানো এই শীতে বিছানা থেকে নামাই যেখানে অসম্ভব সেখানে কে যাবে ছাতে উনুন আনতে। আর, একছুটে উনুনটা নিয়ে এলেই তো হবে না, ধরাতেও হবে ওটা। প্রচণ্ড এই শীতে সে কাজ করবে কে?

অনুর বোন টুনটুনির বয়েস মাত্র সাত, কিন্তু ওর মাথায় মাঝেমধ্যে বড়দের মতো বুদ্ধি খেলে যায়। ও বলল, 'হিটারটা জ্বালাও না দাদা।'

এটা বরং সহজ কাজ। চায়ের জল গরম করার ছোট হিটারটা এ ঘরেই আছে, কোনো মতে প্লাগটা লাগিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু প্রচণ্ড এই শীতের মধ্যে সামান্য এই কাজটা করাও বোধহয় ভয়ংকর কঠিন। তবে, স্কুলের চ্যাম্পিয়ন ফুটবলার অনমিত্র সেন খুব সাহসী ছেলে, কিছুক্ষণ পরে ও হঠাৎ পেনাল্টি-বক্সে বল নিয়ে ঢুকে পড়ার কায়দায় লাফিয়ে পড়ল বিছানা থেকে। তারপর হিটারের প্লাগটা লাগিয়ে দিয়েই আবার শাঁ করে গলে গেল লেপ কম্বলের নীচে।

একটু বাদেই হিটারের তারে লালচে আভা ফুটে উঠল। কিন্তু এই আভাটুকুই সার, এ ঘরের শীত তাড়াবার সাধ্য নেই ছোট্ট ওই হিটারটার।

কষ্টকর শীতের মধ্যে খুব আস্তে আস্তে সময় কাটে। সাতটার পরে আটটা বাজতে বোধহয় দু'ঘণ্টা লেগে গেল। তারপরই জানলার ফাঁক দিয়ে খুব আবছা একটা আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে।

আলোটা কেমন যেন অচেনা। নভেম্বরের কলকাতায় তো এই সময় বেশ চড়া আলো ফুটে যায়। তাহলে কি খুব কুয়াশা জমেছে!

ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ, তবু এ ঘরের সবাই টের পাচ্ছিল বাড়ির বাইরে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটে গেছে। পুরো পাড়াটা আশ্চর্য রকমের থমথমে, কোথাও কোন শব্দ নেই। অনুদের বাড়ির পাশেই বিশাল জোড়া নিমগাছ, ওই গাছ দুটোয় অসংখ্য পাখি এসে রাত্তিরে থাকে। প্রতিদিন ভোর হতে না হতেই তাদের কিচিরমিচির শব্দে সারা বাড়িটা প্রায় কেঁপে ওঠে, কিন্তু তারা আজ কোথায় গেল! আজ তো একটা পাখির ডাকও শোনা যায়নি! তবে কি পরশু রাতের ওই ভূমিকম্পে বিরাট কোনো ওলট-পালট হয়ে গেছে? ভূমিকম্পের কথাটা মনে পড়ে যেতেই অনু একটু ঘাবড়ে গেল।

কিন্তু ভূমিকম্পও তো তেমন কিছু একটা হয়নি। বাড়িটা সামান্য একটু দুলে উঠেই থেমে গিয়েছিল। দেয়াল ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া ভূমিকম্পের আর কোনো চিহ্ন ও কোথাও দেখতে পায়নি। তারপরই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, প্রচণ্ড বৃষ্টি, সঙ্গে কনকনে ঝোড়ো হাওয়া।

দেয়ালঘড়িতে সাড়ে আটটার ঘণ্টা পড়তেই টুনটুনি টুক করে বিছানা থেকে নেমে পড়ে হিটারের আগুনে হাত সেঁকতে লাগল উলটে-পালটে। শীত বোধহয় একটু কমেছে। কিংবা এমনও হতে পারে—বন্ধ ঘরে হিটারের তাপ বহুক্ষণ ধরে ছড়াবার জন্য ঘরটা গরম হয়েছে সামান্য।

এ ঘরের দুটো দরজা। একটা ভেতরের ঘরে যাবার, আর একটা রাস্তায়। টুনটুনি হিটারের আগুনে কিছুক্ষণ হাত গরম করবার পরে রাস্তায় বেরুবার দরজাটার খিল খুলে টান দিল দরজায়, কিন্তু দরজা খুলল না। কিছুক্ষণ টানাটানির পরে ও কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাদের দরজাটা বাইরে থেকে কেউ আটকে দিয়েছে।'

চারদিকের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সবাই কেমন যেন ভয় পেয়েই ছিল, টুনটুনির ওই চিৎকারে বিছানার তিনজন আঁতকে উঠে ছুটে গেল দরজার দিকে। তারপর তিনজনেই দরজা ধরে টানাটানি শুরু করে দিল, কিন্তু দরজা খোলা তো দূরের কথা, পাল্লা দুটো এক চুলও ফাঁক হল না।

আলতো করে টানলেই দরজা খুলে যায় রোজ, কিন্তু এ কী হল আজ! আতঙ্কে প্রচণ্ড শীতের কথা এই মুহূর্তে সবাই বোধহয় ভুলে গিয়েছিল। দরজাটা খোলা দরকার, যে কোনো উপায়ে খোলা দরকার। দরজাটা খোলা না খোলার ওপরেই যেন সবকিছু নির্ভর করছে।

একটা অকেজো শাবল আলমারির কোণায় পড়ে আছে বহুদিন ধরে, হঠাৎ সেটার কথা মনে পড়ে যেতেই অনু ছুটে গিয়ে শাবলটা নিয়ে এল, তারপর গায়ের জোরে সেটা দিয়ে চাপ দিতেই দরজাটা ফাঁক হল সামান্য। দরজার ওপাশে কিসের যেন সাদা স্তূপ, সেই স্তূপের ওপর দিয়ে এক ঝলক হাড়কাঁপানো হাওয়া লাফিয়ে ঢুকল ঘরের ভেতর।

আতঙ্কের সঙ্গে বিস্ময় আর অসম্ভব একটা কৌতূহল চেপে ধরেছিল অনুদের। কোনো মতে দরজাটা খোলার পরে ওদের চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

ওরা কি জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে কী! দুহাত দিয়ে ভাল করে চোখ মোছার পরেও ওরা আগে যা দেখেছিল তাই দেখল আবার। না, ওদের কেউই ঘুমোচ্ছে না; কেউই স্বপ্ন দেখছে না। বাড়ির সামনের এই অলৌকিক দৃশ্যটা তাহলে সত্যি, একেবারে সত্যি।

বাড়ির সামনে ঝুরোঝুরো বরফ পড়ে আছে একগাদা।

বরফের কুচিতেই দরজাটা আটকে গিয়েছিল বিশ্রী ভাবে।

হাঁ করে সামনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে অনুর বাবা থেমে থেমে বললেন, 'অবাক কাণ্ড! কলকাতায় তুষারপাত।'

বাবার গলার স্বরে টুনটুনি বুঝতে পারল, ব্যাপারটা আর যাইহোক, ভয়ের নয়। ও দাদাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'দাদা তুষারপাত কী রে?'

বাড়ির সামনে হঠাৎ এত বরফ দেখে খুশিতে চকচক করছিল অনুর চোখ। উত্তরে ও বলল, 'তুষারপাত জানিস নারে, ওই যে স্নোফল—সিমলায়, কাশ্মীরে, দার্জিলিঙে শীতকালে বরফ পড়ে শুনিসনি।' তারপরেই হাড়কাঁপানো শীতের কথা বেমালুম ভুলে পেল্লায় এক লাফ মারল বরফের ওপর। লাফ মারতেই ধপধপে সাদা বরফের মধ্যে ওর পায়ের পাতা ডুবে গেল টুপ করে। চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে চিৎকার করে উঠল অনু—'অবিশ্বাস! চারদিক কী রকম অদ্ভুত হয়ে গেছে। বাইরে এসে দেখ।'

অনুর চিৎকার শুধু ওর বাবা, মা, বোনই নয়, অবিনাশ জোয়ার্দার লেনের আরো কেউ কেউ বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে। চারদিকে অসম্ভব সব ব্যাপার স্যাপার। অসম্ভব, কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

বরফ পড়ে পুরো গলিটা সাদা হয়ে গেছে। লাইটপোস্টের গায়ে বরফের ঝালর, জানলার শেডে বরফের স্তূপ।

সারা কলকাতায় সবার মুখে একটাই কথা—

কলকাতায় তুষারপাত!

কলকাতায় স্নোফল!

কলকাতায়—অ্যাঁ!

শুধু একদিন বলেই নয়, পর পর আরো দুদিন অল্প-বিস্তর বরফ পড়ল কলকাতায়। সারা পৃথিবীর আবহ-বিজ্ঞানীরা চোখ কপালে তুলে জানালেন, অজ্ঞাত কোনো কারণে গোটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তার ফলে গরমের দেশগুলো শীতের দেশ আর শীতের দেশগুলো গরমের দেশ হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের আরো একটি অনুমান নিয়ে প্রচণ্ড তৎপরতা আর জোর জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল সারা পৃথিবীতে। অনুমানটি হল—বায়ুমণ্ডলের অস্বাভাবিক পরিবর্তন নিছক প্রাকৃতিক কারণে ঘটেনি, এই পরিবর্তনটি ঘটিয়েছে কোনো বিজ্ঞানী। কিন্তু কে সে? কোন পদ্ধতিতে সে এই ভয়ংকর পরিবর্তন ঘটিয়েছে? তার উদ্দেশ্যই বা কী?

বেতারে এই খবরটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কপালে অনেক-গুলো ভাঁজ পড়ল অনুর। ও চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়!

মাত্র দুদিনের মধ্যে কলকাতার জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অনুর মাথায় টুপি, গায়ে ফারের কোট, হাতে দস্তানা আর পায়ে স্নোবুট। অবিনাশ জোয়ার্দার লেনে এক ফুট বরফ জমে আছে। ও তার ওপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে এসে বড় রাস্তায় পড়ল। বড় রাস্তায় কয়েকটি ছোটছোট ছেলেমেয়ে বরফের বল তৈরি করে লোফালুফি করছিল। আকাশের একধারে বিরাট এক সূর্য, কিন্তু সূর্যের তেজ তেমন নেই। সূর্যের আলোয় রাস্তা-ঘাটের বরফগুলো ঝলমল করছিল।

অনু এই রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে আসার পরে মহাত্মা গান্ধী রোডে এসে পড়ল। কুলিরা গাঁইতি আর বেলচা দিয়ে রাস্তার বরফ পরিস্কার করছিল। এতটা হাঁটার পরেও বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হয়নি অনু, আরো অনেকটা চমৎকার হাটা যেতে পারে। কিন্তু সকালের ওই চিন্তাটা মাথার মধ্যে আর একবার ঝাঁপিয়ে পড়তেই ও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ভবানীপুরের একটা বাসে উঠে পড়ল।

বাসে লোকজন বেশি নেই, কাঁচের জানলাগুলো সব বন্ধ। অনু জানলার ধারের একটা সিটে বসে পড়ল। রাস্তায় স্কিড করার ভয়ে বাস ছুটছিল আস্তে আস্তে। শহীদ মিনারের কাছাকাছি এসে অনু নতুন করে অবাক হল আর একবার। গড়ের মাঠে এ-দৃশ্য কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। বরফ-পড়া সাদা মাঠে কয়েকজন স্কী করছে।

ভবানীপুরে বিজ্ঞানী-জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে ঢোকার সময় অনু দেখল গলির বরফের ওপর রোলার স্কেটিংয়ে শাঁ-শাঁ করে ছুটে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ছেলে।

বিজ্ঞানী-জ্যাঠামশাইয়ের ল্যাবরেটরি তিনতলায়। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই জ্যাঠামশাইয়ের ল্যাবরেটরিতে কাটে, কিন্তু ওখানে তিনি তখন ছিলেন না। কোথায় জ্যাঠামশাই? অনেক খোঁজাখুঁজির পরে ছাতে জ্যাঠামশাইকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল অনু।

জ্যাঠামশাইয়ের পরণে পাতলা একটা সুতির কোট আর পাজামা। উসকোখুশকো চুলে পাতলা বরফের কুচি। প্রচণ্ড এই শীতে এ পোশাক পরা আর না পরার মধ্যে কোনো তফাত নেই। জ্যাঠামশাই ছাদের রেলিংয়ে ভর

দিয়ে কেমন যেন তন্ময় হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অনু ডাকতেই চমকে উঠে পেছন ফিরলেন তিনি।

জ্যাঠামশাইয়ের চোখমুখ অসম্ভব বসে গেছে। বোঝাই যায়, দু-তিন রাত তাঁর কোনো ঘুম-টুম হয়নি। অতাকে উঠে অনু বলল, 'শিগগির ঘরে এসো। এভাবে বাইরে থাকলে তোমার তো নিমোনিয়া হয়ে যাবে।'

অনুর কথায় মৃদু হাসতে হাসতে জ্যাঠামশাই প্রশ্ন করলেন, 'কেন, নিমোনিয়া হবে কেন?'

'বারে! বরফ পড়ছে, আর পাতলা পোশাক তুমি দাঁড়িয়ে আছ খোলা হাতে। নিমোনিয়া হবে না?'

'বরফ কোথায়?'

'তোমার মাথায় হাত দিয়ে দেখ।'

জ্যাঠামশাই মাথায় হাত দিলেন না, কিন্তু রহস্যজনক ভঙ্গিতে বললেন, 'কলকাতার ভবানীপুরের ছাতে দাঁড়িয়ে যদি তুষারপাতে মারা যাই, ক্ষতি কী। এ সৌভাগ্য ক'জন বিজ্ঞানীর হতে পারে!'

জ্যাঠামশাইয়ের রহস্যজনক ভঙ্গি আর কথা শুনে অনুর বুকের রক্ত ছলকে উঠল। তাহলে নির্ঘাত ওর অনুমানটাই ঠিক। আবহাওয়া অস্বাভাবিক পরিবর্তনের মূলে আছেন জ্যাঠামশাই।

কোনো কথা না বলে জ্যাঠামশাইয়ের হাত ধরে ওঁকে ল্যাবরেটরিতে টেনে নিয়ে এল অনু। তারপর শুকনো তোয়ালে বিদায় ওঁর মাথা মুছে গায়ে একটা শাল জড়িয়ে দিল। কালো কফি জ্যাঠামশাই খুব পছন্দ করেন, নিজের হাতে পটভর্তি কালো কফি বানিয়ে নিয়ে এল অনু।

কফির কাপে পরপর কয়েকটা চুমুক দিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, 'আহ্!'

একটু পরে হেসে বললেন, 'এবার তোমার খবর কী বলো মিস্টার সেন? গায়ে ফারের কোট, হাতে দস্তানা— তুমি তো দেখছি একেবারে সাহেব হয়ে গেলে।'

অনু একটু হেসে বলল, 'আমি শুধু একাই নই, সবাইকেই তো তুমি সাহেব বানিয়ে দিয়েছ।'

'আমি!' তীব্র চোখে অনুর চোখের দিকে তাকালেন জ্যাঠামশাই।

চোখের দৃষ্টি তীব্রতর করে অনু বলল, 'হ্যা তুমিই। দিনকয়েক আগে তুমিই আমাকে বলেছিলে, 'তোমার আবিষ্কার খুব শিগ্‌গিরই গোটা পৃথিবীর চেহারা পালটে দেবে। কলকাতাকে তখন আর চেনা যাবে না। বলোনি?'

'হ্যা, তা বলেছিলাম, কিন্তু তার মানে কি—'

থামিয়ে দিয়ে অনু বলল, 'আমি অত মানেটানে জানি না, তুমি এবার আমাকে আসল ব্যাপারটা বলো।'

আসল ব্যাপারটা নিয়ে কিছুতেই মুখ খুলতে চাই-ছিলেন না জ্যাঠামশাই, কিন্তু অনুর জেদাজেদির কাছে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল তাঁকে। তাছাড়া, একজন বিজ্ঞানী তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে কতক্ষণই বা লুকিয়ে রাখতে পারেন! একটা চুরুট ধরিয়ে গলগল করে কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়লেন জ্যাঠামশাই, তারপর বললেন, 'আজ বেলা এগারটার নিউজ বুলেটিনটা শুনেছ?'

'না তো। কী বলেছে নিউজে?'

'পৃথিবীর আশ্চর্য সব খবর। জলপাইগুড়িতে দুটো পেঙ্গুইন পাখি দেখা গেছে।'

খবরটার মধ্যে অবাক হওয়ার মতো তেমন কিছু ও

পেল না। পেঙ্গুইন সিরিজের কল্যাণে ও পেঙ্গুইন পাখির ছবির সঙ্গে খুব পরিচিত। কিন্তু পাখিগুলো ঠিক কোথায় থাকে, জলপাইগুড়িতে ওদের পক্ষে আসা সম্ভব কি না—সে-সব সম্পর্কে ওর স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই।

অনুর মুখের দিকে ওর মনের কথা আন্দাজ করতে পারলেন জ্যাঠামশাই, তারপর বললেন, 'পেঙ্গুইন পাখি কোথায় থাকে জানো তো? অ্যান্টার্কটিকায়, তার মানে দক্ষিণ মেরুতে। দক্ষিণ মেরু ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও ওই পাখি থাকে না। সেই পেঙ্গুইন এখন জলপাইগুড়িতে। ভাবতে পারো! জলদাপাড়ার কাছে আবার একটা সাদা ভাল্লুককে দেখা গেছে। আমার মনে হয় ওটা পোলার বিয়ার, উত্তর মেরুর বাসিন্দা। ভাবতে পারো কী ভয়ংকর একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে সারা পৃথিবীর আবহাওয়ায়। এর পেছনে শুধু ছোট্ট একটা—'

'ছোট্ট একটা কী?'

'পরশুর আগের রাতে মৃদু ভূমিকম্প হয়েছিল, টের পেয়েছিল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'ওটা ছিল প্রতিক্রিয়া। মূল ব্যাপারটা ছিল সৌর-জগতে পৃথিবী গ্রহের পাশে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ। সঠিক জায়গায় বিস্ফোরণটা আমিই করিয়েছিলাম। তার ফলে পৃথিবী গ্রহটা ঘুরে যায়, ইকুয়েটরের স্থান পরিবর্তন। মানে গোটা পৃথিবীর আবহাওয়ায় পরিবর্তন। আস্তে আস্তে ভৌগোলিক পরিবর্তনও দেখা দেবে।'

অনু বুঝতে পারল, পরিবর্তনটা মারাত্মক ধরণের পরিবর্তন। কিন্তু সেটা ঠিক কী ভাবে হল, তার ফলে কলকাতায় বরফ পড়ার সম্পর্কই বা কী—পরিস্কার হল না ওর কাছে।

জ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে হাসতে বললেন, 'সূর্য আমাদের কী দেয়?'

'আলো।'

'ঠিক। আলো আর তাপ। সূর্যের আলো যেখানে সরাসরি পড়ে সেখানে তাপ বেশি, আর যেখানে বাঁকা হয়ে পড়ে সেখানে তাপ কম। আর যেখানে ধরতে গেলে পড়েই না, সেখানে সারা বছর বরফ—যেমন, উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। ঠিক তো?'

মনোযোগী ছাত্রের মতো একপাশে মাথা কাত করল অনু।

জ্যাঠামশাইয়ের চুরুটে ছাই জমে গিয়েছিল অনেকটা, ছাই অ্যাসট্রেতে ফেলে তিনি বললেন, 'এই পৃথিবীর অবস্থান যদি হঠাৎ পালটে যায়, তাহলে যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পড়ত সেখানে সূর্যের বাঁকা আলো পড়বে। যেখানে সূর্যের আলো ধরতে গেলে পৌঁছতই না সেখানে এবার থেকে পড়বে। আর যেখানে পড়ত সেখানে ধরতে গেলে আর পড়বেই না। তার মানে গোটা পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন।

জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনতে অনুর মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

জ্যাঠামশাইয়ের মুখে অদ্ভুত একটা আলো এসে পড়েছিল, তিনি কেমন যেন নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন, 'আবহাওয়ায় এই পরিবর্তন কী ভাবে আনা যায়—সেটাই ছিল আমার সারা জীবনের সাধনা। এখন বলতে পারো, আমি আমার সাধনায় সফল হয়েছি।'

অনু হঠাৎ বলে বসল, 'আচ্ছা, আমাদের দেশে আগের মতো বিচ্ছিরি গরমকাল আর তাহলে আসবে না, না?'

'না। তবে বিচ্ছিরি গরমকালের বদলে বিচ্ছিরি শীতকালে আসতে পারে। প্রচন্ড শীত, চারদিকে শুধু বরফ, একটানা তুষারপাত চলছে তো চলছেই। তুষারঝড়ও উঠতে পারে।'

অনু কল্পনার চোখে ভবিষ্যতের কলকাতার এই চেহারাটা দেখে নিয়ে বলল, 'প্যাচপেচে গরমের চাইতে প্রচন্ড শীত অনেক ভাল। আমাদের দেশটা শীতের দেশ হয়ে গিয়ে ভালই হয়েছে। আচ্ছা, আগে কলকাতায় কি কখনো একফোঁটা বরফও পড়েনি।'

জ্যাঠামশাই সুন্দর করে হেসে বললেন, 'কী করে পড়বে? ভারতবর্ষে আগে তো সেই পুরনো ইকুয়েটরের কাছাকাছি ছিল। ইকুয়েটরের দুদিকে ট্রপিক্স্। একদিকে ট্রপিক অব ক্যান্সার আর একদিকে ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্ণ। পৃথিবীর কাল্পনিক এই দুটি রেখার মাঝখানে যতগুলো দেশ পড়েছে সবগুলোই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। ইকুয়েটরে ওপরে কিংবা তার কাছাকাছি দেশে গরম সব চাইতে বেশি।

'এখন কি ট্রপিকস আর ইকুয়েটর থেকে ভারতবর্ষ অনেক দূরে সরে গেছে।'

'নিশ্চয়ই। নাহলে কলকাতায় এত তুষারপাত কী করে হবে। আমি তো ভবানীপুরের গলিতে বরফ পড়া দেখার মধ্যে দু-রাত্তির ঘুমোইনি।' [শেষাংশ ৫৪ পৃঃ]

বিস্ময়ের নোট বই

ছোট বকেরা বড় পশুদের অনুসরন করে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পোকা মাকড় ধরে ধরে খায় এটাই সর্ববিদিত। কারমাইন বি-ইটার নামে এক রকম পাখী পূর্ব ও দক্ষিন আফ্রিকার সবুজ প্রান্তে ঘুরে বেড়ায় মারুসের পিঠে চেপে। উদ্দেশ্য? সেই একই, মারুস জ্বালাতন করে যে সব পোকা মাকড়,তাদের দিয়েই আহার করে পেট ভরায়।

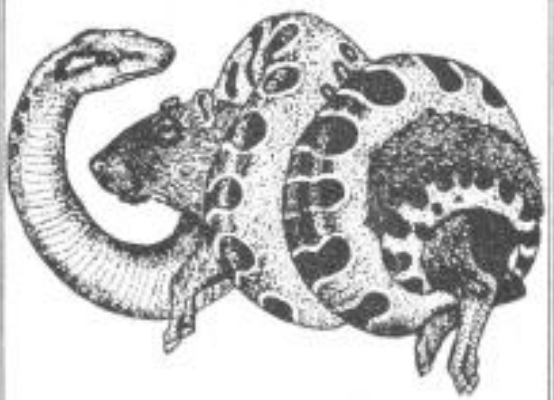

বিশ্বের বৃহত্তম সাপের নাম অ্যানাকোন্ডা। এরা শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে মিনিটেরও কম সময়ে মেরে ফেলে গলায় চাপ দিয়ে।

আমেরিকার বেসিলিস্ক গিরগিটিরা জলে এমন দ্রুত দৌড়াতে পারে যে, একবারও ডুব না দিয়ে বেশ দূরে চলে যেতে পারে। এদের এই বিস্ময়কর ক্ষমতার জন্য স্প্যানীয়রা এদের নামকরন করেছে যীশুখ্রীষ্ট গিরগিটি

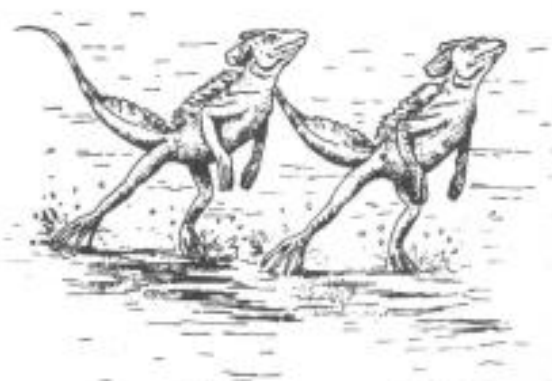

আলবার্ট আইনস্টাইন

এমনকি পাহাড়েও চড়লো কয়েকবার।

কিন্তু কয়েক মাস পরে তার বাবা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এলেন তার কাছে।

তোমার পক্ষে ইঞ্জিনীয়ার হওয়াই বরং ভালো –

কিন্তু তো কলেজে যেতে পারবে না। ওর হাইস্কুল পাশের ডিপ্লোমানেই।

সুইজারল্যান্ডে একটা কলেজ আছে যেখানে ও ভর্তি হতে পারবে, তবে তার জন্য একটা পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। সে চেষ্টা করতেই হবে। তাতে দোষ কি!

অতএব ষোলো বছরের আলবার্ট সুইজারল্যান্ডের জুরিখে গিয়ে পরীক্ষা দিলো।

আলবার্ট পরীক্ষায় ফেল করলো। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ তাকে বললেন –

অঙ্কে তোমার দারুন মাথা আছে দেখছি। তুমি যদি আরাউ-এর হাই স্কুলে এক বছর পড়াশোনা করে আসো, তাহলে আমাদের পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে।

আরাউ জুরিখ থেকে কুড়ি মাইল দূরে। আলবার্ট সেখানে এক শিক্ষকের পরিবারের সঙ্গে বাস করতে লাগলো। স্কুল ও সুইজারল্যান্ডের মানুষ তার ভালো লাগলো।

স্কুলটা দারুন। মাস্টারমশাই আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেন। এতে আমাদের মাথা খোলাতে সুবিধা হয়।

[ক্রমশ]

বিশ্বের বিস্ময়

মানুষ প্রথম কাপড় বুনেছিল তুলো, সিল্ক ও উল দিয়ে। উল দিয়েই প্রথম কাপড় বোনা হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০০ বছর আগে, তুরস্কে। লিনেন তৈরী হয়েছিল মিশরে ৫০০০ বছর বি সি তে। তখন এই লিনেন দিয়ে পোষাক তৈরী হত না শুধু, মমিও জড়িয়ে রাখা হত। ভারতে তুলোর চাষ শুরু হয় যীশুর জন্মের ৩০০০ বছর আগে। চীনদেশে সিল্ক উৎপাদনের রহস্য জেনেছিল ২৭০০ বি সি তে। কিন্তু প্রথম শতাব্দীর আগে ইউরোপের মানুষ সিল্কের ব্যবহার জানতো না। রোম সাম্রাজ্যের সময়ই চীন থেকে ইউরোপে আনা হয়।

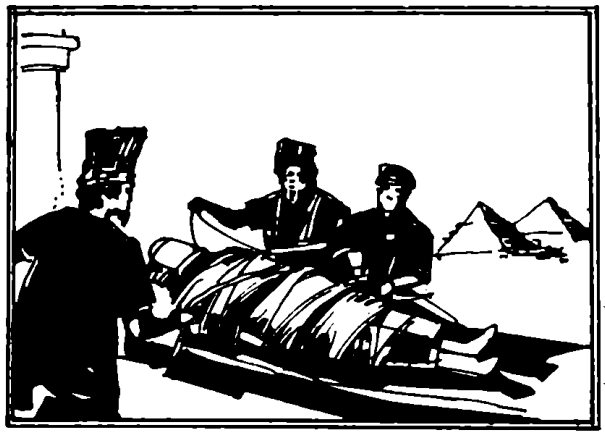

সাহিত্য, শান্তি, বিজ্ঞান এবং আরো অনেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার। যার নামে এই পুরস্কার সেই আলফ্রেড নোবেল জন্মগ্রহন করেছিলেন ষ্টকহোমে। তিনি শুধু বিজ্ঞানী নন কবিও। তিনিই ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি নব্বই লক্ষ ডলার রেখে গিয়েছিলেন ফান্ড করে। নোবেল পুরস্কারের মূল্য, প্রতিটি বিষয়ে ৪০,০০০ ডলার। সুইডেনের নোবেল ফাউন্ডেশন কমিটি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য কয়েকটি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিজয়ী নির্বাচনের। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে ষ্টকহোমের রয়্যাল অ্যাকাডমী অফ সায়েন্স, চিকিৎসা শাস্ত্রে ক্যারোলিন ইনস্টিটুট, সাহিত্যে সুইডিশ অ্যাকাডমী অফ লিটেরেচার এবং শান্তির জন্য নরওয়ে পার্লামেন্টের পাঁচ সদস্যের এক কমিটি এই দায়িত্বে আছেন।

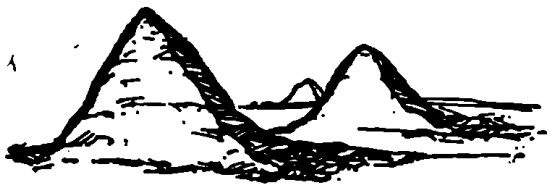

পিরামিডের রহস্য

রাহুল রায় ও পার্থ দত্ত

গত দুই দশকে বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতি অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের দৌলতে আজ আমরা বিশেষ ভাবে শক্তিমান বলেই বোধহয় নিজেদেরকে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে গর্ববোধ করি। বিজ্ঞান আমাদের পৌঁছে দিয়েছে চাঁদে, মহাকাশে, সব কিছুই আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। অন্য গ্রহের অনেক রহস্যের জট আমরা খুলে দিতে পেরেছি বিজ্ঞানের কল্যাণে। এক কথায় আমাদের এখনকার জীবন হচ্ছে বিজ্ঞান-নির্ভর।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এখনো কেমন ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে কম-বেশি পাঁচ হাজার বছর আগে তখনকার যুগের মানুষ যা সৃষ্টি করে গেছে, সে রকম একটা কিছু করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। আজও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার গ্লানি, সফলতা বলতে গেলে এক রকম অনুপস্থিতই বলা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে মিশরের সেই বিখ্যাত পিরামিডের কথা। এই নিবন্ধে সেটাই প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে ধরা যাক।

গিজার সেই সুবৃহৎ পিরামিডের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ২৭০০ সালে এই পিরামিডটি নির্মাণ করা হয়। এই পিরামিডের উচ্চতা আজকের দিনের আকাশ ছোঁয়া বিয়াল্লিশ তলা বাড়ির সমান প্রায়। আমাদের এই কোলকাতার 'টাটা সেন্টার' কিংবা 'এভারেস্ট হাউসের' দ্বিগুণ উচ্চতার সমান এই পিরামিড। প্রায় তেরো-চোদ্দ একর (৪০ বিঘা) জমি নিয়ে এই পিরামিডের বিস্তার। এই বিশাল পিরামিডে যত ইঁট ব্যবহৃত হয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার চারদিকে ছোট-খাটো একটা দেওয়াল তৈরী করা যেতে পারে।

আর পাথরের ব্যবহার? বুঝি একটা বিরাট পাহাড় কেটে এনে এই পিরামিডে লাগানো হয়েছে। সেখানকার এক একটা পাথরের টুকরোর ওজন কমপক্ষে আড়াই থেকে পনেরো টন তো নিশ্চয়ই হবে। হিসাব মতো কমপক্ষে পঁচিশ লাখেরও বেশি পাথর ব্যবহৃত হয়েছে এই পিরামিডে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আদিম যুগের নিরস্ত্র মানুষ এই সব বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই অমন নিখুঁত ভাবে কেটে-ছেঁটে এই পিরামিডে লাগালো কি করে? বিজ্ঞান তো তখনো অনাবিষ্কৃত, তাহলে? ইতিহাসের পাতার পর পাতা ওল্টালেও তার হদিশ আমরা পাই না। তবে আমরা এটুকু জানি, পিরামিড তৈরী হওয়ার অন্তত আটশো বছর পরে মিশরবাসীরা সর্বপ্রথম পাথর কেটে চাকা তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

পিরামিডগুলোয় যে কেবল মানুষের মৃতদেহ মমি করে সংরক্ষিত রাখার জন্য ব্যবহৃত হতো তা নয়, এগুলো এক একটি সুবৃহৎ দিনপঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার এবং সময় নির্দেশক ঘড়িও বলা যেতে পারে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পিরামিডের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের পাথরের দেওয়ালে কতকগুলো দাগ কাটা আছে। পিরামিডে প্রতিফলিত সূর্য রশ্মির ছায়া পড়ে সেই সব দাগগুলোর ওপরে এবং সেই ছায়া পড়া দাগ দেখে হিসেব করলে খুব সহজেই বলে দেওয়া যেতে পারে সেটা বছরের কোন্ দিন এবং সেই মুহূর্তে সময়ই বা কতো, সেটাও সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায়।

আমরা দেখতে পাই পিরামিডের মাঝখানের খাদে নাম-

বার পথটা সমতল ভূমির সাথে ২৩°১৬' কোণ করে আছে। গিজা থেকে ধ্রুবতারার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে গেলে ঠিক ২৩°১৮' বাঁকা একটি ঢালু পথই হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা। যে সময়কার মানুষ লোহার ব্যবহার জানতো না, চাকা পর্যন্ত আবিষ্কার করেনি, এখনকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কথা চিন্তাও করতে পারতো না। আশ্চর্য কি করে তারা এমন বিজ্ঞান সম্মত এবং এতো নিখুঁত ভাবে পিরামিডের কক্ষগুলো তৈরী করলো? এর সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায়নি।

শুধু কি তাই? পিরামিডের রহস্য আরো আছে।

এক সময় বভিস্ নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক মিশরে পিরামিড দেখতে যান। গিজার পিরামিডে গিয়ে তিনি দেখেন, মরুভূমির বহু পশু পক্ষী সেই সব 'মৃতদেহ সংরক্ষণ কক্ষে' প্রবেশ করে জীবিত অবস্থায় সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। হয়ত তৃষ্ণায় অনাহারে মৃত্যু ঘটে থাকবে তাদের সেখানে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বেশ কয়েকদিন আগে তাদের মৃত্যু হলেও তাদের দেহ তখনো অটুট, কোথাও একটুও পচন ধরেনি, কিংবা বিকৃত হয়নি। সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বভিস্ তো গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হতবাক। অবাক হয়ে তিনি ভাবেন, তবে কি পিরামিডের গঠনে এমন কোন কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকবে, যার ফলে এর মধ্যে সংরক্ষিত মৃতদেহ কোন রকম পচন ধরতে না পারে! পিরামিডের সেই আশ্চর্য রূপ দেখে দারুণ ভাবে প্রভাবিত হলেন বভিস্। মিশরের পিরামিডের অনুকরণে কয়েকটা মিনি পিরামিড তৈরী করলেন তিনি। তারপর সেই সব মিনি পিরামিডে মাংস ডিম ইত্যাদি খাবার রান্না করে রাখার ব্যবস্থা করেলন। সেই পরীক্ষা চালাতে গিয়ে আর এক দফা আশ্চর্য হলেন তিনি, দীর্ঘদিন ধরে সেই সব পচনশীল খাবার তাঁর তৈরী পিরামিডের ভেতরে থাকলেও সেগুলো নষ্ট হলো না, কিংবা একটুও পচলো না।

যাইহোক, তারপর এ ব্যাপারে তিনি আর বেশিদূর এগোতে পারেননি। চেকোশ্লাভাকিয়ার কারেল ডরবাল একদিন এক জায়গায় বভিস-এর পিরামিড সংক্রান্ত সেই সব গবেষণার কথা জানতে পারলেন। অতঃপর ডরবাল বভিস-এর অসমাপ্ত গবেষণার কাজকে কেন্দ্র করে নিজে নতুন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে উদ্যত হলেন। তাঁর কাজে সফলতা এলো অচিরেই। তখন তিনি প্লাসটিকের পিরামিড তৈরী করলেন এবং তাঁর আবিষ্কারের একমাত্র দাবীদার প্রমাণ করার জন্য প্লাস্টিকের সেই পিরামিডের পেটেন্ট করিয়ে নিলেন। ভাবতে ভালো লাগে, আজ ডরবালের কারখানায় নিয়মিত হাজার হাজার পিরামিড তৈরী হচ্ছে, বিক্রী-বাট্টাও বেশ হচ্ছে।

তা ওঁদের দেশের লোকেরা এই প্লাস্টিকের পিরামিড নিয়ে কি করে জানো? না, তাদের শো-কেসে সেই সব পিরামিড সাজিয়ে রাখার জন্য কেনে না তারা। আসলে কি জানো, ওদেশে দাড়ি কামানের ব্লেডের খুবই অভাব। আমাদের মতো একটা ব্লেডে দু'একবার দাড়ি কামিয়ে তারা সেটা বাতিল করে দেয় না ভোঁতা হয়ে যায় বলে; সেই ব্যবহৃত ব্লেড তারা ডরবালের মিনি পিরামিডের মধ্যে রেখে দেয় কিছু সময়। তারপর পিরামিড থেকে সেই ব্লেডটা বার করলে দেখা যায়, নতুন ব্লেডের মতোই ধারালো হয়ে গেছে সেটা। কি, খবরটা শুনে খুব আশ্চর্য লাগছে তোমাদের তাই না? বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ তো তোমরা নিজেরাও পরীক্ষা করে দেখতে পারো। ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন নয়। তোমরা যে যার বাড়িতে বসেও ডরবালের পিরামিডের মতো কার্ডবোর্ডের পিরামিড বানাতে পারো।

পিরামিডের চারধার ১৫'৭ থেকে ১৪'৯৪-এর মধ্যে করতে হবে। তা সে মিটার কিংবা ইঞ্চি যাইহোক না কেন! ধারগুলো, অর্থাৎ প্রান্ত সীমানায় সেলোটেপ দিয়ে এমনভাবে লাগাতে হবে যেন তার উচ্চতা ১০ সেন্টিমিটার না হয়। তারপর পিরামিডটা এমনভাবে বসাতে হবে দেখবে ভূমির সীমারেখাগুলো উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম দিকে থাকে। দিক নির্ণয়ের জন্য এক্ষেত্রে কম্পাস অপরিহার্য। পিরামিডের মধ্যে ৩'৩৩ সে, মি, (বা ইঞ্চি) উঁচু একটি স্ট্যান্ড তৈরী করে বসিয়ে রাখতে হবে। আর এই স্ট্যান্ডের ওপরে ব্যবহৃত ব্লেড রাখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ধারগুলো পূর্ব ও পশ্চিমমুখী যেন হয়। আর একটা কথা তোমরা মনে রাখবে, পিরামিডটা যেন কোন বৈদ্যুতিক

[শেষাংশ ১৮ পাতায়]

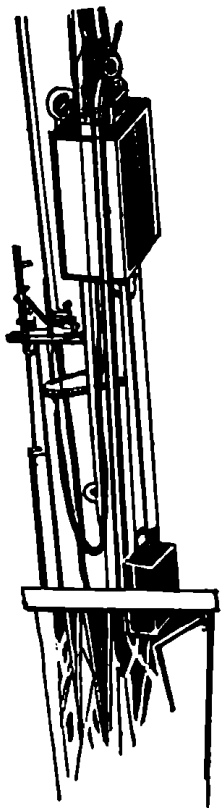

যে ঘর চলে বেড়ায়

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে একবার হাসপাতালে গিয়েছিলাম। কোন হাসপাতাল তা আর এখন ঠিক মনে নেই। সে যাইহোক, সেখানে দেখি এক অবাক কাণ্ড। সিঁড়ি ভেঙে, পা ব্যথা করে কাউকে উপরে যেতে হচ্ছে না। একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে সবাই ঢুকে পড়ছে আর সবাইকে নিয়ে সেই ঘরটা তর তর করে উপরে উঠে যাচ্ছে। তিন তলা, চার তলা কোন ব্যাপার নয়। নামার বেলায়ও ঠিক একই ব্যাপার। আমরা ঘরটার মধ্যে ঢুকে গেলাম আর আমাদের নিয়ে সেটা আবার তর তর করে নীচে নেমে এল। ব্যাপার দেখে আমি তো হতভম্ব। বাবাকে জিজ্ঞেস করাতে বললেন যে ওটার নাম লিফ্‌ট।

তোমরাও যে দিন প্রথম লিফ্‌ট্‌ দেখেছিলে বা চড়েছিলে সেদিন আমার মতই অবাক হয়েছিলে তাই না? সত্যি অবাক কাণ্ডই বটে। সিঁড়ি ভেঙে দশ তলা উঁচুতে উঠতে যেখানে সময় লাগে প্রায় দশ মিনিট সেখানে লিফ্‌টে করে আধ মিনিটেরও কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যায়। তা ছাড়া পা ব্যথা হবারও কোন বালাই নেই।

কোলকাতায় তেমন কোন উঁচু বাড়ী নেই। দশ-বারো তলা যে সমস্ত বাড়ী আছে তাতে আমরা একটু কষ্ট করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে পৌঁছে যেতে পারি। কিন্তু আমেরিকার ১০৩ তলা উঁচু এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং বা সেই রকম বিশাল উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর কথা একবার চিন্তা কর। সিঁড়ি দিয়ে অত উঁচুতে ওঠা প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার। আর যদিও বা সম্ভব হয় তবে নামত বেশ কয়েকবার বিশ্রাম অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু লিফ্‌টে করে ঐ ১০৩ তলায় পৌঁছুতে সময় লাগবে মাত্র পাঁচ মিনিট। এবার লিফ্‌ট কি করে কাজ করে সে কথায় আসা যাক। তোমরা নিশ্চয়ই কপিকল ও দড়ির সাহায্যে কুয়ো থেকে জল তোলা দেখেছো। এটাও একটা লিফ্‌ট যা চলে মানুষের গায়ের জোরে। তোমরা আরও জান যে এভাবে জল তুলতে বেশ পরিশ্রমও হয়। কিন্তু একটু মাথা খাটালে পরিশ্রমটাকে আমরা অনেক কমিয়ে ফেলতে পারি। ধর যে প্রান্তে বালতি তার অপর প্রান্তে একটা ভারী জিনিস বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল। ভারী জিনিসটার ওজন এমন করা হোল যেন তা জল ভর্তি বালতির ওজনের কাছাকাছি হয়। কাজেই এবার বালতি যখন উপরে উঠবে ওজন তখন নীচে নামবে এবং বালতি নীচে নামলে ওজনটা উপরে উঠবে। এই অবস্থায় দেখবে যে জল তুলতে তেমন আর পরিশ্রম হচ্ছে না। দড়িটা একটু টানলেই জল উপরে উঠে আসছে।

লিফ্‌টের কাজ করার পিছনে এই পদ্ধতিটারই প্রয়োগ করা হয়। বাড়ীর ছাদে একটা ড্রাম, যার নাম শীভ, তার ওপর স্টীলের মোটা মোটা দড়ি জড়ানো থাকে। এই দড়ির এক প্রান্তে লিফ্‌টের কামরা ও অন্য প্রান্তে একটা ওজন ঝোলানো থাকে। এবার যদি কোন মতে শীভটাকে ঘোরানো যায় তবে দড়িটার একপ্রান্তে পাক খেয়ে গোটাতে থাকবে এবং অন্য প্রান্ত পাক খুলে ঝুলে পড়তে থাকবে। কাজেই শীভটা উল্টো দিকে ঘুরলে লিফ্‌ট নীচে নামবে, ওজনটা উপরে উঠবে। শুধু দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকলে লিফ্‌টের কামরা এদিক ওদিক দুলবে। তাই দুটো রেল বসানো থাকে যার মধ্য দিয়ে তা সোজা ওঠা নামা করতে পারে। ওজনের জন্যও এ রকম দুটো রেল বসানো থাকে। ছবি থেকে তোমরা ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারবে।

বহুকাল আগে রোমান আমলে হাতে চালানো একরকম লিফ্‌টের ব্যবহার ছিল। আজকের লিফ্‌টের সঙ্গে তার কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। লিফ্‌ট বলতে তা ছিল একটা কাঠের পাটাতন যা একটা কপিকল দিয়ে ঝোলানো থাকতো। লোকেরা গায়ের জোরে সেই কপিকল ঘুরিয়ে লিফ্‌টকে ওটা নামা করাতো। কাজেই বুঝতে পারছ যে এই লিফ্‌টে করে খুব বেশী ভারী জিনিস তোলা সম্ভব ছিল না। সাধারণত রাজমিস্ত্রীরা ওর সাহায্যে তাদের মাল মশলা উপরের তলায় তুলত।

স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার হবার পর ওর সাহায্যে লিফ্‌ট চালাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ওতে বড় ঝাঁকানি হোত

যে মানুষ চড়ার পক্ষে তা উপযুক্ত হোল না। এখনও খনি থেকে ভারী জিনিসপত্র তুলতে স্টীম ইঞ্জিন চালিত লিফ্‌টের ব্যবহার আছে। এরপর জলের চাপ শক্তি বা হাইড্রলিক শক্তি দিয়ে লিফ্‌টে চালাবার চেষ্টা হোল। কিন্তু দেখা গেল যে খুব উঁচুতে মালপত্র বা মানুষ তোলা এই লিফ্‌টের পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর সব শেষে এল এখানকার মত বিদ্যুৎ শক্তি চালিত লিফ্‌ট। একটা বৈদ্যুতিক মোটরকে গীয়ারের সাহায্যে শীভ এর সঙ্গে যুক্ত করা হোল। বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠিয়ে মোটর ও সেই সঙ্গে শীভকেও ঘোরানো সম্ভব হোল। ১৮৮৪ সালে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে ওটিস নামে এক ভদ্রলোক প্রথম এই লিফ্‌ট চালালেন। বৈদ্যুতিক লিফ্‌টে আরও একট সুবিধা হোল এই যে, বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে মোটরকে খুব সহজেই উল্টো সোজা ঘোরানো সম্ভব হোল এবং লিফ্‌টও সেই সঙ্গে সহজেই ওঠা নামা করতে পারল।

আজ আমরা যে সমস্ত লিফ্‌ট্ দেখি তাদের কতকগুলো সয়ংক্রিয় বা অটোমেটিক। যাত্রীরা নিজেরাই বোতাম টিপে ইচ্ছেমত সেগুলোকে চালাতে পারে। আবার কতগুলির বেলায় একজন চালক থাকে যে যাত্রীদের কথামত লিফ্‌ট্ চালায়। এইসব লিফ্‌টে একটা হ্যাণ্ড্‌েল্ থাকে এবং চালক যখন এটা সোজাসুজি খাড়াভাবে রাখে তখন মোটরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, তাই লিফ্‌ট্‌ও দাড়িয়ে পড়ে। হ্যাণ্ডেলটা বাঁ-দিকে রাখলে মোটরের মধ্যে যে দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, ডান দিকে রাখলে প্রবাহিত হয় তার বিপরীত দিকে। কাজেই হ্যাণ্ডেলটা বাঁদিকে রাখলে যদি লিফট ওপরে ওঠে তবে ডান দিকে রাখলে নীচে নামবে।

অটোমেটিক লিফ্‌টের বেলায় ব্যাপারটা ঘটে অন্য রকম। ধর তুমি পাঁচ তলায় যাবার জন্য ৫ নম্বর বোতাম টিপলে। তোমার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচতলায় একটা লিভার কিছুটা মাথা বার করে রাখবে। এবং লিফট যেই পাঁচ তলায় যাবে অমনি ঐ লিভারের সঙ্গে ধাক্কা খাবে। এতে করে মোটরের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং লিফ্‌ট্‌ও থেমে যাবে। তা ছাড়া তুমি ক'তলা থেকে ৫নং চাবি টিপছো তা বুঝে নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোটরের বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং তুমি প্রয়োজমত উপরে উঠবে বা নীচে নামবে। এছাড়া অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে আছে আপনা আপনি দরজা বন্ধ হওয়া, খোলা, দরজা বন্ধ না হলে লিফ্‌ট্ চালু না হওয়া ইত্যাদি।

লিফ্‌টে চড়তে তোমাদের একটু ভয় ভয় করে তাই না? মনে হয় যদি দড়ি ছিড়ে পড়ে যায় তবে কি হবে? শুনলে অবাক হবে সে সব রকম যান বাহনের মধ্যে লিফ্‌ট হোল সব চাইতে নিরাপদ। ৫ কোটি বার যাতায়াতে দুর্ঘটনা ঘটে মাত্র একবার। লিফ্‌ট্‌কে নানাভাবে সুরক্ষিত করার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। প্রথমত যে চারটে দড়ি দিয়ে লিফ্‌ট্‌টা ঝোলানো থাকে তার মাত্র একটা দড়ি যাত্রীসহ ওরকম চারটে লিফ্‌ট ঝুলিয়ে রাক্ষার পক্ষে যথেষ্ঠ। কাজেই ছিঁড়ে পড়ে যাবার ভয় নেই বললেই চলে।

দ্বিতীয় ভয় হোল যে যদি দড়িগুলো শীভএর গা থেকে পিছলে যায়। এজন্য দুটো শীভ ব্যবহার করা হয় এবং দড়ি-গুলো এদের গায়ে এমন ভাবে জড়ানো হয় যে লিফ্‌টের টান যত বাড়বে দড়িগুলো তত কষে শীভ-এর গায়ে জড়িয়ে থাকবে। এত সব ব্যবস্থা নেওয়া সত্বেও যদি কখনও দড়ি ছিড়ে যায় বা শীভ এর গা থেকে পিছলে যায় তবে লিফটের তলায় দুটো লিভার বেরিয়ে রেলের গায়ে আটকে যাবে এবং লিফ্‌ট্‌কে থামিয়ে দেবে।

[১৬ পাতার পরের অংশ]

সরঞ্জামের কাছে রাখা না হয়।

আর যদি তোমরা মনে করো, বাড়িতে পিরামিড বানানোয় অনেক ঝামেলা, তাহলে এক কাজ করতে পারো, ডাকযোগে টাকা পাঠিয়ে সরাসরি পিরামিড নির্মাতাদের কাছ থেকে একটা পিরামিড আনিয়ে নিতে পারো। তাদের ঠিকানা নিচে দেওয়া হলো :—

এভারেই এ্যাসোসিয়েটস।
৪৩, এগলিনটন ইস্ট।
টরেন্টো।

দাম তিন ডলার। পিরামিডটি প্লেক্সিগ্লাসের তৈরী।

এতো সব তো বললাম, কিন্তু আমার মূল প্রশ্নটাই তো অনুত্তর রয়ে গেলো। পিরামিডের এত সব গুণাবলির ব্যাখ্যা আজ আমাদের বৈজ্ঞানিকরা দিতে পারছে না কেন? তাদের কি কিছুই বলার নেই? অথচ ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এই সব বৈজ্ঞানিক তত্ব মিশরবাসীদের কাছে কে বা কারা জানিয়ে দিয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তরও আমরা কোনদিন পাবো কি?

ভুতুরে গাছ

শংকর ঘটক

প্রাণকেষ্টবাবু আজ খুবই অন্যমনস্ক। নিজে বুঝতে পারলেন সেটা। অতিরিক্ত সাবধান হতে হবে আজ। অন্যমনস্ক হয়ে যাতায়াত করলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু মাথা থেকে চিন্তাটা সরাতে পারছেন না কিছুতেই। গাছটাকে প্রথম দেখেই একটু কেমন কেমন মনে হয়েছিল। আর পাঁচটা ভালিয়া গাছের মতন একরম নয়। একটু বেশি সতেজ, একটু বেশি প্রাণবন্ত ছিল সেটা। শিশু অবস্থাতেই।

গাছের সখ প্রাণকেষ্টবাবুর অনেক দিনের। ফুলের গাছ। সে খবর রাখেও অনেকে। যারা ব্যবসায়ী। গাছ বিক্রি করার ব্যবসা যাদের! তেমনি একজন অচেনা অজানা ব্যবসায়ী ঘরে এসেই দিয়েছিল গাছটা।

বুড়োর চেহারাটা মনে পড়তেই আরেকবার শিউরে উঠলেন তিনি। হাড় ঝিড় ঝিড়ে শরীরের ওপর বসান প্রকাণ্ড একটা মাথা চোখ দুটো যেন জ্বলছে। কপালে বলিরেখা। তোবড়ান গাল। আর চিবুকের নীচে একগুচ্ছ শনের দড়ির মত সাদা ধবধবে দাড়ি।

'নিয়ে নিন বাবু, ঠকবেন না। বড় সুন্দর ফুল ফুটবে। শুধু খায় একটু বেশি।'

'বেশি খায় মানে?'

'এই জলটল, সার একটু বেশি করে দেবেন একে। আর চাই রদ্দুর। ঝলমলে তাজা রোদ্দুরে ভিজিয়ে রাখবেন। নইলে কষ্ট পাবে।'

কটা টাকাই বা দাম। আর, কিছুটা অনুসন্ধিৎসার জন্যই গাছটা কিনে ফেল্লেন প্রাণকেষ্ট বাবু।

একতলার পুবদিকের ঘরেই প্রাণকেষ্ট বাবুর শোবার ব্যবস্থা। সেই ঘরের জানলাটার পাশেই একখণ্ড জমি, যার পুব-পশ্চিম দুটোই খোলা। সারাদিনই রোদ আসে সেখানে।

সেই জমিটুকুর মাঝখানটিতে পুঁতে দিলেন নতুন কেনা ডালিয়া গাছের চারাটা।

রাত্রিবেলা শিশু ডালিয়া গাছটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অবাক হয়ে যেতেন প্রাণকেষ্ট বাবু।

ওটা যেন কেমন।

আর পাঁচটা ডালিয়া গাছের মত একদম নয়।

পুরু পুরু পাতা। বেপরোয়াভঙ্গি—একটা কেউকেটা কেউকেটা ভাব। সব গাছই সবুজ, কিন্তু এই গাছটির রঙ গাঢ় সবুজ। একটা তীব্রতা আছে ওর রঙের। ভোরের সূর্যের আলো এসে ওর গায়ে পড়লে ওকে দেখায় আরো জীবন্ত। মাথাটা বেঁকিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে সূর্যের দিকে ঠায় চেয়ে থাকে। সূর্য্যকিরণ যেন গিলে খাচ্ছে।

সবই প্রাণকেষ্ট বাবুর নিজস্ব কল্পনা হতে পারে। বুড়ো বিক্রেতার খাপছাড়া চেহারা আর রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা ওর মনে একটা অহেতুক কল্পনা জাগিয়ে দিয়েছে। গাছটার কাছ থেকে অলৌকিক কিছু একটা পাবার প্রত্যাশী হয়েছে তাঁর মন। আর তারই প্রত্যক্ষ ফল, কল্পনার বিস্তার।

প্রাণকেষ্ট বাবু নিজেও ভেবেছিলেন তাই। ও কিছু নয়। মনের ভ্রম। কিন্তু টুপু যখন এসে বল্ল কথাটা, তথাপি তাঁর মনে একটা খটকা লাগল। টুপুও তাহলে লক্ষ করেছে ব্যাপার স্যাপার।

'তোমার ঐ গাছটা যেন কেমন।' টুপু সন্দেহ ব্যক্ত করে। 'মোটেই অন্য গাছের মত নয়। ওটা একটা ভুতুড়ে গাছ।'

'গাছের আবার ভূত কিরে? ভূত ত' শুধু মানুষের বেলাতেই হয় শুনেছি।'

'মানুষ মরলে ভূত হতে পারে, গাছ মরলে পারে না? তুমি যাই বলো ওটা একটা ভূতুড়ে গাছ।' টুপু তার বিশ্বাসে অবিচল।

প্রাণকেষ্ট বাবু হাসেন। ভূতে তার বিশ্বাস নেই। তার ওপর আবার গাছের ভূত! ও আর কি করবে? তা সত্ত্বেও গাছটার রকম সকম দেখে মাঝে মাঝে একটু আধটু ভয় পেতেও শুরু করলেন তিনি।

ওঠা সূর্যের আলোর জন্য কেমন যেন উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে। ওর গোড়ায় জল ঢাললে ও কেমন যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আর যখন সার দেন, মুহূর্তেই সেগুলো যেন মাটির ওপর থেকেই উধাও হয়ে যায়। যে পরিমাণ সার ওর গোড়ায় দিচ্ছেন প্রাণকেষ্টবাবু, অন্য গাছের গোড়ায় দিলে সে গাছ সত্যি সত্যি মরে ভূত হয়েই যেতো।

কিন্তু প্রথম যেদিনে প্রাণকেষ্ট বাবু ভয়ে শীতল হয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন প্রথম বুঝলেন ওঠা গাছ নয়, অন্য কিছু, সেদিনের কথা ভাবলে আজও গা শির-শির করে ওঠে।

রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ওনার অভ্যেস বাগানে একটু হাঁটা। হাতে টর্চ থাকে, বলা যায় না, সাপ-টাপ এসব থাকতেই পারে। তার ওপর যদি লোডশেডিং হয়, তখন অন্ধকারে গাছ মাড়িয়ে ফেলারও সম্ভাবনা।

সেদিনও তিনি রাতে বেড়াচ্ছেন বাগানে। সেদিনও লোড-শেডিং ছিল। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার। লোডশেডিং হলে কেমন যেন নিঃস্তব্ধতা জেগে বসে পৃথিবীর ওপর। মানুষ কথা বলাও যেন বন্ধ করে দেয়।

একটু গা ছমছম করে উঠল প্রাণকেষ্ট বাবুর। একটা শীতল বাতাসের স্পর্শ তাঁর গা ছুঁয়ে চলে গেল যেন। কেমন একটা থমথমে পরিবেশ!

'তবে কি ডালিয়া গাছটা···?' বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথায় খেলে যায় তাঁর। আর সংগে সংগেই টর্চ জ্বালেন গাছটা লক্ষ্য করে।

অবাক বিস্ময়ে আর সম্মোহিত ভয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, ডালিয়া গাছটার গর্বিত, উদ্ধত মাথাটা দ্রুত নড়ে উঠল আর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো টর্চলাইটের আলোর দিকে। একটা লোভী সরীসৃপের মত মুখটা বাড়িয়ে দিলো আলোর ঝর্ণার মধ্যে।

কোনরকমে অফিসে পৌঁছলেন তিনি। উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা। এলোমেলো চুল। অফিসে ঢুকতেই নীতিন বোস অবাক হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে।

'বাড়িতে কিছু হয়েছে আপনার? আপনাকে এরকম লাগছে কেন?'

নিজের চেয়ারটা ঠিকঠাক করে নিয়ে বসেন প্রাণকেষ্টবাবু, প্রয়োজনীয় কাজের ফাইলটা খোলেন। তারপর বলেন, 'বড্ড বিপদে পড়েছি ভাই। বলব সব।'

নীতিন বোস আর কথা বাড়ান না। প্রাণকেষ্ট বাবু নিজে থেকেই বলবেন যা বলার। ওনাকে বিরক্ত না করাই ভালো।

কাজে মন না বসলেও, যান্ত্রিকভাবে দ্রুত কাজ সারার চেষ্টা করেন প্রাণকেষ্টবাবু। তারপর উঠে এসে বসেন নিতিন বোসের টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারে।

নিতিন বোস মুখ তুলে তাকান।

'আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?' প্রাণকেষ্টবাবুর প্রশ্ন।

'ভূত? ভূত কেন?'

'আমার বাড়িতে ভূত। মানুষ ভূত নয়। গাছ ভূত।'

'কি সব আবোল তাবোল বকছেন?'

প্রাণকেষ্টবাবু এবার সোজা হয়ে বসেন। 'সত্যিকারের ভূত ভাই, চোখেও দেখা যায় ওর কীর্তিকলাপ।'

'পরিষ্কার করে বলুন ত। ব্যাপারটা শুনি!'

বিস্তারিত বলে যান প্রাণকেষ্টবাবু। গাছটা কেনার দিন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বৃত্তান্ত। যত শোনেন, তাই বিস্ময়াবিষ্ঠ হয়ে পড়েন নিতিন বোস। ভূতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু অতটুকুন একটা ডালিয়া গাছের কার্যকলাপে তিনি অবাক হয়ে গেছেন নিঃসন্দেহে।

প্রথম প্রথম আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। যতদিন যাচ্ছে ততই কিন্তু ওর অদ্ভুত অদ্ভুত সব ব্যাপারে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। যেমন ওর তেজ, তেমনি ওর বাড়ন্ত গড়ন। অন্যান্য একই বয়সী গাছগুলো থেকে ও অন্ততঃ আধ-মিটার বেশি লম্বা। পাতাগুলো ওর অত্যন্ত পুরু। আধসেন্টিমিটার থেকে এক সেন্টিমিটার। পাতাগুলোর আকৃতিও বেশ বড়ো সড়ো। একটা খুব ভাল স্বাস্থ্যের ডালিয়া গাছের অন্ততঃ পাঁচগুণ ওর চেহারা।

আর তেমনি ওর ক্ষিদে। জল দিয়ে দিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ওর গোড়াটা কিন্তু শুকনো। যত জল দিচ্ছি, সার দিচ্ছি, ততই যেন ও তরতর করে বেড়ে উঠছে।

ওর বাড়-বাড়ন্ত দেখেছি সম্ভবতঃ ওর আশপাশের গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। হলদেটে হয়ে যাচ্ছে সেগুলোর পাতা। কেমন যেন মৃতপ্রায় চেহারা।

ওটা সত্যিই ভূত। গাছের ভূত। অন্যান্য গাছগুলোকে ওটা শুষে নিচ্ছে। প্রাণটাকে শুষে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। গোড়ায় দুচারটে ঘাস ছিল। সেগুলো পর্যন্ত হলদে হয়ে গেছে। অথচ, সারাটা দিনে ওখানে রোদ্দুর থাকে!'

অবাক হয়ে শুনছেন নিতিন বোস। 'আজ তাহলে একবার আপনার বাসায় যেতে হচ্ছে। অমন অদ্ভুৎ ব্যাপারত শুনিনি কখনো।'

'বাড়ি গিয়ে কি দেখব কে জানে। কাল রাতে যা ঘটেছে, আর যেভাবে দ্রুতগতিতে ঘটনার গতি বাঁক নিচ্ছে, বাড়ি গিয়ে কি দেখব কে জানে! টুপু, টুপুর মা, সবারই বাগানে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু ওরা কথা শুনলে হয়। বাড়িতে এখন একটা থমথমে ভয়ের আবহাওয়া। পাড়া-পড়শীকেও বলা যাচ্ছে না, একান, ওকান হতে হতে শেষ পর্যন্ত গোটা কলকাতা শহর আমার বাড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। গাছটার ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে!'

'আসলে কি জান, ওর ওপর আমাদের মায়াও পড়ে গেছে। আমাদের ক্ষতিও করেনি কোন! তবে…।'

কথায় ছেদ পড়ে। আত্মনিবিষ্ঠ হয়ে পড়েন নিজের ভাবনায়। ভয়ের ছাপ পড়ে চোখে মুখে। বিবর্ণ হয়ে যায় মুখ।

'কালকের ঘটনাটায় একটু ভয়ই পেয়ে গেছি আমরা।'

'কি হয়েছিল কাল?' নিতিন বোস সোৎসাহে তাকায়।

'যতই ভয় পাই, ও আবার টানছেও ত আমাদের সমান ভাবে। অতি সহজেই গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে দিতে পারতাম বাইরে। আপদ চুকে যেতো। কিন্তু তা-ও যে পারছি না। ঘুরে ঘুরেই যাই ওর কাছে।'

গতকাল রাতে তেমনি একটি ঘটনা ঘটেছে। টুপুর খাওয়া হয়ে গেছে। প্রাণকেষ্টবাবু খেতে বসেছেন। হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো টুপু। মুখে চোখে আতঙ্ক। ভয়ে কাঁপছে থরথর করে। খেয়ে উঠেই সে একটা টর্চ হাতে গিয়েছিল গাছটার কাছে। টর্চ জ্বালালে গাছের মাথাটা কেমন নড়ে চড়ে ওঠে সেইটেই দেখার জন্য। কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসেছে বাগান থেকে।

'বাবা, গাছটা নেই। ভূত হয়ে চলে গেছে।'

'ভূত হয়ে চলে গেছে কিরে?' তড়াক করে খাওয়া

ফেলে লাফিয়ে ওঠেন প্রাণকেষ্ট বাবু। 'নিশ্চয়ই কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে!'

এঁটো হাতেই সোজা চলে গেলেন বাগানে। টুপু টর্চ হাতে পেছনে পেছনে ছুটল।

'জ্বাল, টর্চটা···দেখি!'

অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন প্রাণকেষ্ট বাবু গাছটা নেই। টুপুকে টর্চটা ধরে রাখতে বলে, তিনি এগিয়ে গেলেন নির্দিষ্ট জায়গাটা লক্ষ্য করে যেখানে গাছটার থাকার কথা। খুব মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করলেন। এবং তার পরেই তাঁর মাথাটা ঘুরে গেল।

গাছটা প্রায় অদৃশ্য, পুরোপুরি অদৃশ্য নয়। টুপুর টর্চের আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে। অনেকটা ছায়ার মতো। কালো মতো। গা ছমছম করে উঠল প্রাণকেষ্ট বাবুর। তবু, এত কাছেই যখন একবার স্পর্শ করে দেখা যাক!

ধীরে ধীরে ডান হাতটা, এঁটো হাতটাই, বাড়িয়ে দিলেন গাছটার দিকে। অন্ধকার ছায়া ছায়া একটা ডালকে ধরলেন দু'আঙুলে চেপে।

আর মুহূর্তেই ছিটকে চলে এলেন দূরে। টুপুর একটা হাত ধরে প্রায় ছুটেই চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে!

গাছের প্রায় অদৃশ্য ডালটা যেন বরফ দিয়ে তৈরী। প্রাণকেষ্টবাবুর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা সিড়সিড়ানির ঢেউ নেমে গেল তা প্রাকৃতিক হিমেল স্পর্শে। তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝলেন এর আগের দিন তার গায়ে শীতল হাওয়ার পরশ তিনি পেয়েছিলেন কেন।

তারপর সারাটা রাতই তার অনিদ্রায় কেটেছে। জানলা দিয়ে বারে বারেই চোখ চলে যাচ্ছে অদৃশ্য ডালিয়া গাছটার দিকে। আর ওদিক থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসা হিমেল হাওয়ার স্পর্শে তার সর্ব অঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠেছে। তারপর ধীরে ধীরে, ভোরের আলো যখন পুব আকাশে ফুটে উঠল, জেগে উঠল ডালিয়া গাছটাও। ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে গেল সে-ও।

ভোর বেলায় গাছটার কাছে গিয়ে প্রাণকেষ্ট বাবু দেখলেন, গাছটার একটা ডাল কে যেন গরম সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছিল।

প্রাণকেষ্টবাবু তার আঙুলের দিকে তাকালেন।

* * *

নিতিন বোস বল্লেন 'তোমার গাছ গাছাড়ির ব্যাপার যখন, অনিমেষকে নিয়ে যাওয়া ভালো। আমার বন্ধু। বোটানির অধ্যাপক। বিখ্যাত বিজ্ঞানী।'

প্রাণকেষ্টবাবু রাজি হয়ে গেলেন এই প্রস্তাবে। ডক্টর অনিমেষ চৌধুরীর নাম অনেকেরই জানা। ক'দিন আগে তাঁর একটা আবিষ্কার নিয়ে বেশ হৈ চৈ হয়েছিল। পাতার রঙ সবুজ। কিন্তু শীতকাল এলেই অধিকাংশ গাছের পাতার রঙ পালটাতে থাকে। প্রথমে হয় হলুদ, তারপর লালচে, আর সব শেষে গাঢ় বাদামী। পাতাটা তখন ঝরে যায়। এই রঙের পরিবর্তন কেন হয়, এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হলেও, কারণ আবিষ্কারের কৃতিত্বটা অনিমেষ চৌধুরীই পেয়েছেন।

টেলিফোনে যোগাযোগ করার সাথে সাথেই অধ্যাপক চৌধুরী রাজি হয়ে গেলেন। শুধু রাজি নয়, অনতি-বিলম্বেই তিনি ঘটনাস্থলে হাজির হতে চান। তাঁর ভয়, অতি উৎসাহে কিংবা ভয়ে কেউ যদি গাছটির কোন ক্ষতি করে ফেলে!

প্রাণকেষ্টবাবু, নিতিন বোস আর অনিমেষ চৌধুরী যাত্রা করলেন অকুস্থলের উদ্দেশে। গাড়িতে নিতিন বোসই জিগ্যেস করলেন অধ্যাপক চৌধুরীকে।

'তোমার কি মনে হয়, ওটা সত্যিই ভূত?'

হেসে ফেলেন অধ্যাপক। 'ভূত কিহে? জল খাচ্ছে, বাতাস খাচ্ছে, সূর্যের কিরণও খেয়ে ফেলেছে, এসব নিতান্তই পার্থিব ব্যাপার স্যাপার। এখানে ভূত আসে কি ভাবে!'

'এমন ত সচরাচর দেখা যায় না কিনা!'

'তা ঠিক। সচরাচর এমনটা দেখা যায় না বটে। কিন্তু তা হলেও, এর একটা ব্যাখ্যা ত পাওয়া যায়!'

'কি, সে ব্যাখ্যা?'

'যদিও আমি দেখিনি এখনো গাছটাকে। তবু, তোমাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, এই গাছটির আলোক সংশ্লেষণ ক্ষমতা খুব বেশি। এবং তারই ফলে এমন সব অদ্ভুৎ ব্যাপার ঘটতে দেখা যাচ্ছে। মানুষের মধ্যেও এমন ঘটনা ঘটতেই দেখা গেছে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই কয়েক বছর আগে একটি লোক তার অবিশ্বাস্য খাবার ক্ষমতা দেখিয়ে অনেককে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। একটা গোটা পাঁঠা, কয়েক ডজন ডিম, গোটা একটা লাউ, একঝুড়ি ভাত আরো কতো কি খেয়ে ফেলত এক সাথে?

[এরপর ৩৯ পৃঃ]

তেমনি গাছেদের বেলাতেও যদি তেমন কিছু ঘটে, আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই।

প্রাণকেষ্টবাবু চুপচাপ বসে এই সব কথোপকথন শুনছিলেন। একটু নড়ে চড়ে বসে প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক চৌধুরীকে। 'আলোক সংশ্লেষণ ব্যাপারটি কি, ডক্টর চৌধুরী?'

'আলোক সংশ্লেষণ হচ্ছে উদ্ভিদ জগতের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় গাছপালা বাতাসের কার্বন-ডাই অক্সাইড আর জলীয়বাষ্প এবং মাটি থেকে অন্যান্য অজৈব আর জৈব পদার্থ ও জল টেনে নিয়ে, সূর্য্যের কিরণ দিয়ে রান্না-বান্না করে। এই ভাবেই তারা কার্বোহাইড্রেট সহ বহু পদার্থ উৎপাদন করে তাদের পাতায়। অক্সিজেন ছেড়ে দেয় বাতাসে। এই কাজে অসাধারণ সাহায্য করে ক্লোরোফিল নামে কিছু যৌগিক পদার্থ।'

'ক্লোরোফিল! মানে পাতার সবুজ অংশ?'

একটু হাসলেন অধ্যাপক চৌধুরী। 'শুধু সবুজ নয়। এর সঙ্গে আরো নানা রঙের ক্যারোটিনয়েড্ শ্রেণীভুক্ত জৈবযৌগও থাকে। কিন্তু প্রধানতঃ থাকে সবুজ রঙের ক্লোরোফিল। তাই অন্য রঙগুলো দেখা যায় না। শীতকালে সবুজ যৌগটা বিযোজিত হয়ে যায় এবং তার ফলেই তখন অন্য রঙের যৌগগুলো আমরা দেখি। গাছের পাতা রঙ পালটায়। কবিরা কবিতা লেখেন। গায়ক গান করেন। অবশ্য এর সংগে শীতের ফুলের বাহারও আছে।'

শুনতে বেশ ভালো লাগছে। নিতিন বোস আর প্রাণকেষ্টবাবু তন্ময় হয়ে শোনেন। নিতিন বোসই এবার প্রশ্নটা করেন।

'এই ক্লোরোফিল সূর্য্যের আলো দিয়ে কি ভাবে এই চমৎকার রান্নাবান্না করে?'

প্রশ্নটা বেশ কঠিন। একটু ভাবেন ডক্টর চৌধুরী। সহজ করে কিভাবে বলা যায়।

'শুধু ক্লোরোফিল একাই এ কাজটা কিন্তু করে ফেলতে পারেনা। এতে সক্রিয় ভূমিকা নেয় কতগুলো উৎসেচক। দই কিভাবে তৈরী করা হয় জানত? উষ্ণ দুধে একটু দই দিতে হয়। দইয়ে থাকে সক্রিয় কিছু উৎসেচক। কতগুলো জীবন্ত প্রোটিন যৌগ। এগুলো নিজেরাও সংখ্যায় বাড়ে আর দুধকেও দই-এ পালটে ফেলে। আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতেও এ ধরনের কিছু উৎসেচকের সক্রিয় ভূমিকা আছে। আমরা এগুলোকে বলি অটোট্রপিক ফটো কেমো-লিথোট্রেপিক ব্যাকটেরিয়া, অ্যালজি। কি আশ্চর্য এদের ক্রিয়া জান? ভাবতেও অবাক লাগে! বাতাসের প্রতি চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বনডাই অক্সাইডকে খাদ্যে পরিণত করতে এরা ব্যবহার করে তিন লক্ষ নিরানব্বুই হাজার ক্যালোরি সূর্য্যের উত্তাপ।

এই ভাবেই প্রাচীনকাল থেকে যুগ যুগ ধরে গাছ সঞ্চয় করে রেখেছে সূর্য্যের শক্তি। এরা না থাকলে সূর্য্যের শক্তিকে ধরে রাখত কে? আর আমরাই বা থাকতাম কোথায়?'

একটু থামেন অধ্যাপক। তারপর নিজের মনেই বলে চলেন।

'এই গাছ থেকেই কয়লা হয়েছে। আর এই গাছ থেকেই প্রাণীর খাদ্য সংগ্রহ করেছে। আর সেই প্রাণী থেকে হয়েছে খনিজ তেল। এই কয়লা আর পেট্রলই বিশ্বের শক্তির উৎস। এই সব শক্তিই এসেছে সূর্য্য থেকে। আর সেই শক্তিকে সঞ্চয় করে রেখেছে গাছ। গাছ না থাকলে আমাদের অস্তিত্বই থাকত না।'

অজানা এ সব কথা শুনতে শুনতে কখন তাঁরা পৌঁছে গেছেন প্রাণকেষ্টবাবুর বাড়িতে। ড্রাইভারের ডাকে চমক ভাঙে তাঁদের।

গাড়ি থেকে নেমে তিন জনেই হাঁটা দিলাম বাড়ির দিকে। তখন বেশ একটা জটলা শুরু হয়েছে সেখানে। খবর চেপে রাখ যায় না। কি প্রক্রিয়ায় যেন একজন দুজন করে অনেকেই জেনে গেছেন খবরটা।

সকলের চোখে মুখেই উৎকণ্ঠার ছাপ। কেউ কেউ প্রাণকেষ্টবাবুর কাছে এগিয়ে এসে অযাচিত উপদেশ দিলেন পুলিশে খবর দেবার জন্য। কেউ আবার দমকলেও খবর দিতে চান। পুজো-আর্চার পক্ষপাতি অনেকেই, কিন্তু ঠিক কোন্ দেবতার আওতায় এটি পড়বে সে বিষয়ে একমত হতে না পারায় ওই প্রস্তাবটা বিশেষ জোরদার হতে পারছেনা।

ওদের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে ঊর্ধশ্বাসে প্রায় ছুটেই গেলেন অধ্যাপক চৌধুরী। চিনিয়ে দেবার লোকের প্রয়োজন নেই। লোকেদের দেখে বোঝা যাচ্ছে কোথায় সেই গাছটা।

অকুস্থলে পৌঁছে কিন্তু হতভম্ব হয়ে গেলেন অধ্যাপক। এ দৃশ্য তার কল্পনারও বাইরে। কুঁচকুচে কালো রঙের একটা বিরাট গাছ। দেড়-দু'মিটার লম্বা। পাতাগুলোর কলেবর কলাপাতাকেও ছাড়িয়ে যায়। সব চাইতে অদ্ভুৎ ব্যাপার, গাছটিতে সবুজ রঙের ছিঁটে ফোঁটাও নেই। কালো রঙে কে যেন চুবিয়ে নিয়েছে গাছটাকে।

গাছটির কাছাকাছি কোন গাছ আর বেঁচে নেই। শুকিয়ে সব মরে আছে। আর একটি জিনিস লক্ষ করলেন ডক্টর চৌধুরী। কৃষ্ণকায় গাছটির আশপাশটা কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার! আর তার সাথে হিমেল অনুভূতি। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব একটা। কোন বরফের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা বাতাসের মতো।

'দেখছেন, কেমন তড়তড় করে বেড়ে উঠছে। সকালে যখন অফিসে বেরুচ্ছি, তখন ওটা খুব বেশি হলে এক মিটার লম্বা ছিল। এই কয়েক ঘণ্টায় কত বেড়ে উঠেছে।'

'উঠবেই ত! সর্বনেশে গাছ ওটা! কখন থেকে বলছি সময় থাকতে থাকতে ওটাকে কেটে ফেল। কেউ কি কানে নিচ্ছে সে কথা? চোখের সামনে সবুজ গাছটা কালো হয়ে গেল। কারুর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই কেন!' অবনি বুড়োকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছে। ওনার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় এমটি উনি দেখেননি আগে।

গাছটাকে কেটে ফেলার নাম করতেই ডক্টর চৌধুরী প্রতিবাদ জানালেন।

'কাটবেন কেন? ওটা আমাদের কি ক্ষতি করেছে?'

'এখনো করেনি। শুধু গাছ গাছাড়ি নিয়েই ওটা আছে এখন। কিন্তু এর পরেই আমাদের পালা। এ বলে রাখলুম।'

'কখনই নয়। ওর আশে পাশের গাছগুলোকে ও মোটেই খায়নি। ওগুলো মরেছে কার্বনডাই অক্সাইড আর আলোর অভাবে।'

'কি ভাবে জানলেন আপনি?' চশমার ফাঁক দিয়ে মন্তব্যটা ছুড়লেন অবনি বুড়ো।

'অনুভব করতে পারছেন কি, এখানে নিঃশ্বাস নিতে বেশ আরাম লাগছে? ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে?'

এ ব্যাপারটা কিন্তু এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেন নি। সত্যিই এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে। এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন।

'এখানে এখন অক্সিজেন অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু কতক্ষণ যে গাছটির আয়ু বুঝতে পারছি না। জলের বড্ডো অভাব। ওর যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন তা-ও পাচ্ছেনা। আর ঐ জন্যই ওর পাতাগুলো কাঁপছে। থর থর করে কাঁপছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন সবাই। একটা বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে ওর।'

ডক্টর চৌধুরীকে ঘিরে বেশ ভিড় জমে উঠল। ভদ্রলোককে এখানকার কেউই চেনেন না! কিন্তু কথাগুলো ওনার কেমন যেন অন্যরকম। এতক্ষণ ভূত ভেবে কত জল্পনা কল্পনা হচ্ছিল। এই ভদ্রলোক তার ধারে কাছেও গেলেন না। একটু অন্যরকম কথা বলছেন উনি।

'একটু জলের ব্যবস্থা করতে পারেন আপনারা ওর জন্য ? দেখছেন না কেমন কষ্ট পাচ্ছে ?'

সংগে সংগেই একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। আর বালতি বালতি জল এসে পৌঁছতে লাগল সংগে সংগেই।

আশ্চর্য হয়ে সবাই লক্ষ্য করল, মাটিতে জল ঢালার সংগে সংগেই সব জলটুকু যেন ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে যেতে লাগল।

গাছটার রঙ হয়ে যেতে লাগল আরো কালো। এই ভাবেই চল্ল কয়েক ঘন্টা।

কিন্তু রক্ষা করা গেল না। শুধু জলে ওর ক্ষিদে মিটছে না। চাই টন টন সার। অত সার এক্ষুণি কোথায় পাওয়া যাবে ?

সম্মোহিত অবস্থায় উপস্থিত দর্শকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, শুধু ক্ষিদের জ্বালায় একটা জীবন্ত প্রাণের অপমৃত্যু।

টুপুর দুচোখ বেয়ে নেমে এলো দুফোঁটা জল।

'প্রাণকেষ্টবাবু আর নিতিনের কাছে ঘটনাটা শুনেই আমি বুঝেছিলাম এই ভৌতিক গাছটার স্বরূপ। অতিরিক্ত আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্যই যে এমন ব্যাপারটি ঘটেছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু এমন অপূর্ব জীবনী-শক্তিধারী গাছটির পরমায়ু যে এত কম তা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না। যদি থাকত, তার ব্যবস্থা আমি আগে থেকেই করার চেষ্টা করতাম।'

সমবেত দর্শকদের অনুরোধে, ডক্টর চৌধুরীকে পুরো ঘটনাটা ব্যাখ্যা দিতে হল।

'আজকের পৃথিবীতে শক্তির সংকট একটা সর্বাধিক আলোচিত সমস্যা। আপনারা হয়ত জানেন না, যে হারে আমরা পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করছি তাতে দু হাজার আঠারো সালে পৃথিবীর তেলের শেষ ফোঁটাটি খরচ হয়ে যাবে। কয়লার পরিমাণও অসীম নয়। আর পরমানু জ্বালানীর পরিমাণ আরো কম ! আমাদের হাতে থাকছে একমাত্র জ্বালানীর উৎস হিসেবে সূর্যের শক্তি। যে শক্তি সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁচচ্ছে। কিন্তু সে শক্তিকে সঞ্চয় করে রাখা মানুষের একার পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র গাছই পারে সেই শক্তি সঞ্চয় করতে আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া দিয়ে। কিন্তু প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে, গাছ, সূর্য থেকে সংগ্রহ করা মোট শক্তির শতকরা এক ভাগেরও কম ব্যবহার করে রান্নার কাজে। বাকিটা সে প্রতিফলিত করে দেয়।

বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন এমন গাছ তৈরী করতে, যে গাছ সূর্যশক্তির অন্ততঃ পনেরো শতাংশ সঞ্চয় করতে পারবে। সেই শক্তি সঞ্চয় ক্রিয়ার বাড়তি লাভ—প্রচুর অক্সিজেন। যা আবহমন্ডলকে স্বাস্থ্যকর করে তুলবে।

ঐ ডালিয়া গাছটির আলোক সংশ্লেষণ ক্ষমতা ছিল অনেক অনেক বেশি। অক্সিজেনের প্রাচুর্য ছিল তাই ওর চার পাশে।

নিতিন বোসই প্রশ্ন করে। 'গাছটাকে কালোই দেখাচ্ছিল কেন ? ঠান্ডাই বা লাগছিল কেন ওখানে ?'

'গাছকে সবুজ দেখায়। কারণ গাছের পাতা সূর্যের শক্তি থেকে সবুজ রঙটি বাদ দিয়ে বাকিটা শোষণ করে। এই গাছটির অতিরিক্ত ক্ষিদে থাকায়, এ, সবুজকেও রেহাই দেয়নি। তাই ওর কোন রঙই ছিল না। আমরা দেখছিলাম কালো।

ঠান্ডার ব্যাপারটা কিন্তু আরো সোজা। সূর্যের শক্তিটাকে ও গোগ্রাসে গিলে ফেলেছিল। তাই ওর আসপাশের বাতাসটা হয়ে যাচ্ছিল ঠান্ডা। আলোর তাপ, সবই ত শক্তি। আর শক্তিই ওর খাদ্য।'

প্রাণকেষ্টবাবু তারপর বহু খোঁজ করেছেন। হাটে বাজারে, বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, গাছগাছারির দোকানে। সেই বুড়ো বিক্রেতাকে আর খুঁজে পেলেন না। অধ্যাপক চৌধুরীর আক্ষেপের কথা ভোলা যাচ্ছে না। 'বুড়ো অজান্তে যা আবিষ্কার করেছিল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারও তার কাছে ম্লান হয়ে যেতো।'

বিস্ময়কর আবিষ্কার

অশোক রায়

রসায়ন শাস্ত্রে একটি সতর্ক বাণী আছে, 'প্রত্যেক রসায়নবিদের উচিত রসায়নগারে কোন পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর ভাল করে হাত পরিস্কার করে নেওয়া।' কিন্তু এই সাবধানবাণী জানা সত্বেও পরীক্ষাগারে কাজে ডুবে যাওয়ার ফলে ব্যাপারটা অনেকেই সহজেই ভুলে যান। প্রখ্যাত মার্কিণ রসায়ণবিদ ইরা রেমসেনের সঙ্গে কাজ করছিলেন তাঁরই ছাত্র কনস্টানটাইন ফালবার্গ। সময়, ১৮৭৯ সাল। হঠাৎ একদিন পরীক্ষাগারে বসে ভুলক্রমে হাতের চেটো দিয়ে ঠোঁট ঘষে ফেলেন। হাতে তখন নতুন পদার্থের কিছু গুঁড়ো-দানা লেগেছিল, তা তিনি খেয়াল করেন নি। একটু পরে শুষ্ক-ঠোঁটে জিভ বোলাতে গিয়ে অনুভব করলেন মিষ্টি স্বাদ। আবার জিভ বোলালেন, আবার মধুর স্বাদ। এবার আঙ্গুল জিভে ঠেকালেন, মিষ্টি স্বাদে মুখ ভরে গেল। অবাক হলেন। ব্যাপারটা কি? তারপর সেই উৎপন্ন পদার্থের একটি মিহি দানা জিভে পরখ করলেন, দেখলেন, হ্যা ঐ দানারই স্বাদ চিনির মত। এইভাবেই ফালবার্গ আবিষ্কার করলেন স্যাকারিন!

সাইরাকিউসের রাজা হিয়েরো নিজের জন্য তার স্যাকরাকে ডেকে একটি স্বর্ণমুকুট তৈরী করতে আদেশ দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে মুকুট তৈরী হয়ে এল। রাজা হিয়েরোর কি রকম সন্দেহ হল। মুকুটটা নিরেট সোনার কিনা তা তিনি যাচাই করতে চান। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ বছর আগের কথা। সোনা যাচাই করতে চাই বললেই যাচাই করা সম্ভব নয়! অগত্যা ডাক পড়ল রাজসভার বিজ্ঞানীকে। তার ওপরেই ভার পড়ল ব্যাপারটা সমাধান করতে। সম্রাটের শর্ত ছিল মুকুটটার ক্ষয়ক্ষতি না করে বলতে হবে খাঁটি সোনার কিনা! বিজ্ঞানী বেশ কিছুদিন চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলেন। শেষে হঠাৎ একদিন টইটম্বুর বাথটবে স্নান করতে গিয়ে যেই শরীরটা টবে ডোবালেন সঙ্গে সঙ্গে কিছু জল উপচে পড়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনে সমাধানের উপায় খেলে গেল। আনন্দে বিভোর হয়ে জামা-কাপড় না পড়েই নগ্ন অবস্থায় সাইরাকিউসের রাস্তা দিয়ে 'ইউরেকা, ইউরেকা' বলে ছুটতে ছুটতে তার পরীক্ষাগারে এসে হাজির হন। মুকুটের সমান ওজনের একটুকরো বিশুদ্ধ সোনা জলভর্তি পাত্রের মধ্যে ঢেলে দেন। ফলে কিছু জল উপচে পড়ল। তা তিনি পরিমাপ করেন। এরপর সোনার মুকুটটা ঐ জলভর্তি পাত্রে ফেলে দেন। এবং দ্বিতীয়বার উপচে পড়া জলও পরিমাপ করেন। তিনি দেখলেন প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারের উপচে পড়া জলের আয়তন ভিন্ন। এই থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে মুকুটটা সম্পূর্ণ সোনার নয়। হ্যাঁ, আর্কিমিদিস হলেন সেই বিজ্ঞানী। আর এইভাবেই আবিষ্কার করলেন আপেক্ষিক গুরুত্বের ভৌতিক সূত্র।

[আগের কথা ঃ

একটা বন্ধ উন্মাদের তৈরী রোবট বাহিনী ধ্বংস করে ফেলেছে মানবজাতিকে। মানবজাতিকে বাঁচাতে টারজনের সাহায্যের প্রত্যাশায় এসেছে ২২৬০ সাল থেকে বোরোভিয়াক। পৃথিবী রক্ষা করতে পারে চারটি চাবি। সেগুলি আছে ইলেকট্রিক তালা ঝোলা ভল্টে। বোরোভিয়াক ইশারা করতেই ভোজবাজির মত আবির্ভূত হয় ধূমায়িত বৃক্ষের পাশে একটা প্রদীপ্ত চৌকোনা দরজা। এখানেই সাক্ষাত হ'ল গুহামানবদের সঙ্গে। গুহবাসী গ্রঙকে পরাজিত করে তাকে কব্জা করে ফেলল টারজন। ওরা পরিকল্পনা করে রাজা ওংকারকে পরাজিত করে ছিনিয়ে নেবে পাথর।]

ওংকারের চাহনি দেখেই তার মনের ভাব আঁচ করে নেয় টারজন। বনের রাজাকে নিয়ে কি করবে, তা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছেনা। টারজন তাই তার কাছে একটা উটকো উৎপাত—পথের কাঁটা।

গ্রঙও আঁচ করেছিল ওংকারের মনোভাব।

তাই হঠাৎ এক পা এগিয়ে এনে আঙুল তুলে টানজনকে দেখিয়ে বললে—গ্রঙের বন্ধু—টারজন। দুজনে মিলে সাপ মেরে এনেছি সবার জন্য!

শুনে তো মহাখুশী গুহামানবের দল। পড়ি কি মরি করে দৌড়োলো গুহার দিকে সর্প-মাংসের সিংহের বখরা নিতে।

সরে এল টারজন আর গ্রঙও। ওংকার যে আড়চোখে

তার দিকেই তাকিয়ে আছে—চোখ এড়োলোনা। চাহনির মধ্যে ঘৃণার বিচ্ছুরণ!

টারজন কিন্তু নির্বিকার। যেতে যেতেই বলে গ্রঙকে—চলো তো দেখে আসি পাথরখানা।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় গ্রঙের। সভয়ে তাকায় চারপাশে। না, কেউ শুনতে পায়নি। নিজের গুহার অন্ধকারে টারজনকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে ফিসফিস করে—ওংকার যতক্ষণ ক্ষমতায়, আমার ক্ষমতা নেই পাথরের কাছে যাওয়ার। পাথর সরাতে বাধা দিতে গেছিলাম বলেই তো সবার চোখের বালি আমি। কিন্তু কাল যদি বিরাট লম্বাচুলো জানোয়ারটাকে শিকারে বেরিয়ে মারতে পারি, তাহলেই—

'কিভাবে শিকার করবে শুনি?'

'মাটিতে বিরাট গর্ত আছে। সবাই মিলে আওয়াজ করি আর চেঁচাই পেছন থেকে—তাড়া খেয়ে লম্বাচুলো জানোয়াররা দৌড়ে যায় সামনে—গর্তের ফাঁদে আটকে যায়। শিকারী হিসেবে আমার যে দারুণ নাম ডাক—এমন চেঁচাই—'

'আগুন জ্বালাও না?'

'আগুন মানে?' নিরীহ ভাবে শুধোয় গ্রঙ।

অবাক হয়না টারজন। সময়-পথে এত পেছিয়ে এসেছে যে এ যুগের মানুষের পক্ষে আগুন জিনিসটা কি—তা জানা সম্ভব নয়।

গ্রঙের বিছানা থেকে টেনে নেয় এক মুঠো শুকনো ঘাস আর শ্যাওলা। এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ে চকমকি পাথর। ছুরির বাঁট দিয়ে ঠোকাঠুকি করতেই আগুনের ফুলকি গিয়ে পড়ে ঘাস আর শ্যাওলায়। ধোঁয়া উঠতে থাকে সেকেণ্ড কয়েক পরে। ফুঁ দিতেই লাফিয়ে ওঠে লকলকে শিখা। বিষম আতংকে লাফিয়ে পেছিয়ে যায় গ্রঙ।

'দেবতা! দেবতা! তুমিও দেবতা! আকাশের বিদ্যুৎই কেবল জ্বালাতে পারে আগুন!'

ভয়ে ভয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে পেশীবহুল মানুষটা। হাত দিয়ে চাপড়ে আগুন নিভিয়ে দেয় টারজন। টেনে তোলে গ্রঙকে।

বলে—এর মধ্যে কোনো জাদুবিদ্যা নেই। লম্বাচুলো জানোয়ারও ভয় পাবে আগুনকে। কাল শিকারে খেল শুরু হবে আগুনের।

সূর্য উঠলো। গুহার মুখে জড় হল গুহামানবরা। হাতে প্রস্তর-ফলক লাগানো বর্শা।

টারজন আর গ্রঙ বেরিয়ে এল গুহা থেকে। দু-হাতে বয়ে নিয়ে এল মশালের বোঝা। রাত জেগে বানিয়েছে।

সন্দিগ্ধ চোখে দেখছে ওংকার।

রওনা হ'ল পুরো দলটা—ওংকারের হুকুমে। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল বিরাট লম্বাচুলো জানোয়ারদের। ম্যামথ। হাতী তাস্তোরের জাতভাই। মুখের দু-পাশে বিরাট দাঁত—বাঁকানো। ম্যামথ শিকার করা বড় কঠিন। টারজন প্রস্তুত হয় মনে মনে।

মাইলখানেক দূরে একটা খাড়াই পর্বত-প্রাচীরের সামনে গভীর খাদ। সেইদিকে আঙুল তুলে দেখায় গ্রঙ। ম্যামথরা সেইদিকেই। তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে সহজেই।

হাওয়া বইছে ম্যামথদের দিক থেকে। কাজেই গুহামানবদের গায়ের গন্ধ পায়নি ম্যামথ-দল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে শিকারীরা।

মোট ছ-টা ম্যামথ অলসভাবে চরছে অনেকগুলো গাছের জটলার মধ্যে। খাচ্ছে ডাল আর পাতা। যে-কোনো একটাকে শিকার করতে পারলেই বেশ কয়েকদিন ভূরিভোজ চলবে মানবদের।

ওংকার হাত তুলে এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিতে যাচ্ছে, ঠিক তখনি সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠল গ্রঙ—'দাঁড়াও! দ্যাখো গ্রঙের নতুন রকমের শিকারের কায়দা—'আগুন' দিয়ে!'

হকচকিয়ে গেছে গুহামানবরা। ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকাচ্ছে ইতিউতি।

টারজনের পাণে তাকায় গ্রঙ। চোখে ইসারা।

ছুরি আর চকমকি বার করে ঠোকাঠুকি শুরু করে দেয় টারজন। দপ্ করে জ্বলে একটা মশাল। তাই থেকে আরেকটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে ধরিয়ে দেয় গ্রঙের হাতে।

জ্বলন্ত মশালটা সঙ্গে সঙ্গে একজন গুহামানবের দিকে এগিয়ে দ্যায় গ্রঙ—'ধরো! আগুন নিয়ে তাড়া করো! জন্তুরা ভয় পায় আগুনকে!'

ভয় পায় গুহামানবরাও। বিষম আতংকে পেছিয়ে যায় একযোগে। ভয়ের গোঙানি প্রত্যেকের কণ্ঠে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে ওংকার। দুই চোখে ঘৃণা। মজা পায় গ্রঙ। দৌড়ে গিয়ে জ্বলন্ত মশালটা বাড়িয়ে ধরে তার দিকে।

'ওংকার! আগুন নাও!'

দ্বিধায় পড়ে ওংকার। ভয় ঢুকেছে তারও প্রাণে। চেষ্টা করে ভয়কে জয় করতে। কিন্তু পারে না। পেছিয়ে যায় অন্যদের মত।

তাই তো চায় গ্রঙ। ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলে গুহা-মানবদের—চললাম। আমি আর টারজন শিকার করব—আর কারো দরকার নেই।

কিন্তু টারজনের পরিকল্পনা তা নয়। তা সত্ত্বেও বাধা দেয় না। গ্রঙ তার দলের ওপর আধিপত্য ফিরিয়ে আনবে। তাই হোক। টারজনের দরকার পাথরটা—গ্রঙকে সাহায্য করবে সেই মতলবেই।

এক বোঝা শুকনো মশাল নিজে নিয়ে আরেকটা বোঝা তুলে দেয় গ্রঙের হাতে। গ্রঙের সে কী দাঁত খিঁচুনি হাসি! দুজনে গুহামানবদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় ম্যামথ শিকারে।

* * * *

দুজনের মধ্যে ব্যবধান থাকে তিরিশ গজ। নিঃশব্দে এগিয়ে যায় ম্যামথদের দিকে। ঝোপ থেকে ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রঙ। টারজনের মতই শিকার-নিপুণ।

তার মত একশ গজ যখন বাকী, আচম্বিতে টনক নড়ল ম্যামথদের। শুঁড় তুলে বৃংহিতধ্বনি করল একজন।

তৎক্ষণাৎ আড়াল থেকে সবেগে বেরিয়ে এল টারজন—জ্বলন্ত মশাল তুলে ধরে নাড়তে নাড়তে ছুটে গেল সামনে—পেছন পেছন এল গ্রঙ।

আতংকিত ম্যামথরা ধুপধাপ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে দৌড়োচ্ছে খাদের দিকে। দাঁড়িয়ে গিয়ে আর একটা মশাল ধরিয়ে নেয় টারজন। পেছনেই শোনে গ্রঙের শিকার হুংকার।

হুংকার ছাড়ে টারজনও—'ক্রী-ঈ-ঈ-ঈ-গা।' ধেয়ে যায় সামনে। পাশাপাশি দুজনে মশাল নেড়ে ম্যামথদে'র তাড়িয়ে নিয়ে যায় খাদের দিকে।

খাদ আর মাত্র শখানেক গজ দূরে। এসে গেছে সবচেয়ে

বিপজ্জনক মুহূর্ত। ভয়ার্ত ম্যামথরা ঘুরে দাঁড়িয়ে দুজনকে পায়ে পিষে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে—অথবা সটান সামনে দৌড়ে গিয়ে খাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু টারজনের দরকার তো একটা ম্যামথ—সেতো জানে বেশীর ভাগই খাদের মুখ থেকে সরে আসবে—কিন্তু যেভাবেই হোক একটাকে ফেলতে হবে খাদে।

সেই একটা যে কোনটা তা দেখে নিয়েছিল টারজন। একটা বুড়ো ম্যামথ। রয়েছে, ঠিক মাঝখানে। দলের বাকী পাঁচটা ম্যামথ যখন এদিকে দৌড়োচ্ছে, বুড়ো বেচারী ঠিক করে উঠতে পারছে না কোন দিকে যাবে।

একেই লক্ষ্য করে ধেয়ে গেল টারজন—জ্বলন্ত মশাল দিয়ে জ্বালিয়ে ছিল শুকনো ঝোপ। দেখাদেখি গ্রঙ আগুন ধরিয়ে দিল ঝোপে। লেলিহান আগুন পট পট্ শব্দে পালানোর পথ বন্ধ করে দিল বিমূঢ় ম্যামথ বেচারার।

সামনে আগুনের দেওয়াল, পেছনে খাদ, দু-পাশ থেকে মশাল নাড়তে নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে টারজন আর গ্রঙ।

বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ায় বুড়ো ম্যামথ। বিশাল পদভারে মেদিনী কাঁপিয়ে তীরবেগে ধেয়ে যায় খাদের দিকেই। বিকট চেঁচাতে চেঁচাতে তাড়া করে দুই শিকারী।

আচম্বিতে আর দেখা যায় না মহাকায় ম্যামথকে। ডালপাতা দিয়ে ঢাকা গর্তের মুখে পা দিতেই ভয়ানক বৃংহিতধ্বনি করে তলিয়ে যায় নিচে—গুরুভারদেহ পতনের শব্দ ভেসে আসে অনেকদিক থেকে—থর থর করে কেঁপে ওঠে পায়ের তলার মাটি।

বিকট উল্লাসে উন্মত্ত চিৎকার করে জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বর্শা বাগিয়ে টারজন আর গ্রঙ ধেয়ে যায় ম্যামথের দেহ-পিঞ্জর থেকে প্রাণটাকে বার করে দেওয়ার জন্যে…

ভূরীভোজ সাঙ্গ হয়েছে। ম্যামথের কাঁচা মাংসে উদর পূর্ণ করে বিশ্রাম নিচ্ছে গুহামানবরা। মূল গুহাপথে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় টারজন আর গ্রঙ। এই গুহার একদম পেছনের দিকে আছে রহস্যময় সেই পাথর।

গুহামানবদের বেশীর ভাগই পেট ঠেসে যাওয়ার ফলে ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে। কয়েকজন অদ্ভুত খেলা খেলছে আঙুলে আঙুল দিয়ে। টারজন আর গ্রঙের দিকে নজর নেই কারুরই।

গুহাপথ এক জায়গায় গোল হয়ে মোড় নিয়েছে। মোড় ঘুরেই দাঁড়িয়ে যায় গ্রঙ। হাত তুলে দেখায় সামনে।

নতজানু হয়ে বসে রয়েছে ওংকার। ক্ষীণ দ্যুতির পটভূমিকায় সুস্পষ্ট কালো দেহরেখা। দ্যুতির আবির্ভাব ঘটছে একটা নিখুঁত গোলাকার ক্রিস্ট্যাল থেকে। ছোট্ট ক্রিস্টাল। রয়েছে দেওয়ালের একটা খাঁজে। আশ্চর্য দ্যুতি ঠিকরে বেরোচ্ছে এই পাথর থেকেই।

ইসারায় গ্রঙকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় টারজন। না, কোনো সন্দেহই নেই—এই সেই চাবি—পাথরের আকারে নির্মিত গুপ্ত ভল্টের চাবিকাঠি।

আরো কাছে এগোয় পা টিপে টিপে ভালো করে দেখবার জন্যে। অকস্মাৎ গুন-গুন শব্দ জাগ্রত হয় হাতের কব্জিবন্ধতে।

নিস্তব্ধ তমিস্রাময় গুহায় এ-কিসের শব্দ! সবিস্ময়ে পেছনে তাকিয়েছে ওংকার। টারজন দাঁড়িয়ে পেছনে! টারজন—বাইরের আদমী—ওংকারের পবিত্র গুহা মধ্যে?

সবেগে উঠে দাঁড়ায় ওংকার। ঝাঁপিয়ে পড়ে টারজনের ওপর।

অতিশয় তৎপর গ্রঙ পেছন থেকে ছিটকে এসে রুখে দাঁড়ায় টারজনের সামনে—ওংকারের সঙ্গে হাতাহাতি হবে তার সঙ্গেই—আর কারো সঙ্গে নয়।

ক্ষ্যাপা মোষের মত তার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওংকার। দুজনেই ছিটকে যায় মাটিতে। আঁচড়ে কামড়ে বিকট হুংকারে খান খান করে দেয় নিথর গুহার নৈশব্দ্য।

তারই মাঝে রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে ওঠে গ্রঙ—'পাথরটা নিয়ে নাও!'

টারজনকে বলার দরকার ছিল না। সে তখন দৌড়োচ্ছে পাথর লক্ষ্য করেই।

যতই কাছে আসছে। ততই লক্ষ ভ্রমর-গুঞ্জনের মত গুন গুন শব্দটা বেড়েই চলেছে।

চেঁচামেচি শুনে গুহামানবরা দৌড়ে এসেছে। ভীড় করে ঢুকেছে গুহার মধ্যে। দেখছে দুজনের ঝটাপটি।

ইতিমধ্যে দেওয়ালের খাঁজটার সামনে পৌঁছে গেছে টারজন। হুঁশিয়ার ভঙ্গিমায় হাত বাড়ায় খাঁজে রাখা পাথরটার দিকে। তীব্রতর হয়ে ওঠে গুঞ্জনধ্বনি। হাতে তুলে নেয় গোলাকার চাবিকাঠি—ঘুরে তাকায় গ্রঙের দিকে।

[চলবে]

ভয়ংকর যাত্রা

[ক্রমশঃ]

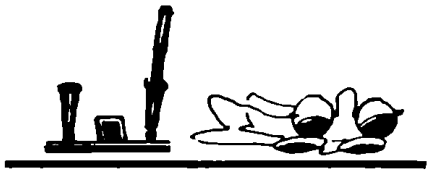

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

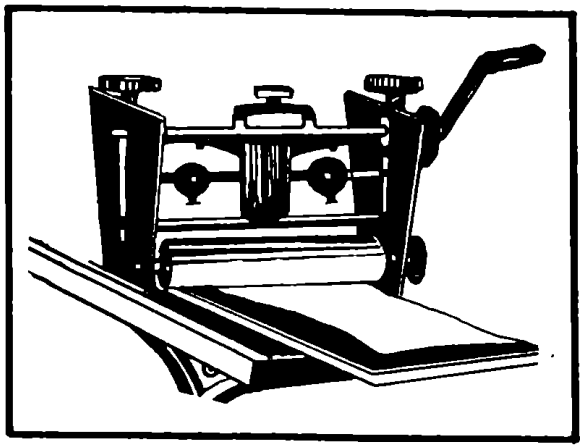

লিথোগ্রাফি

আবিষ্কার করেছিলেন
অ্যালয় সেনিফেল্ডার
(১৭৯৮ সালে)

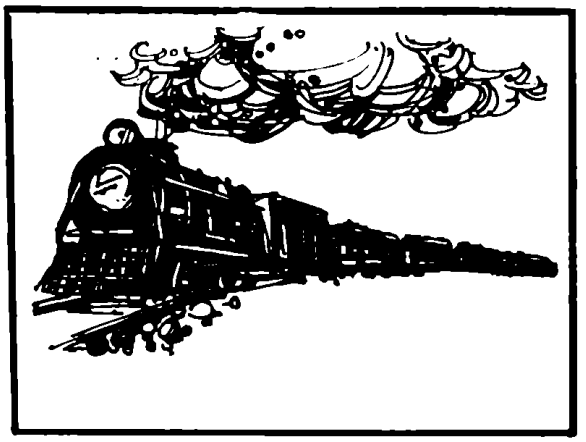

উচ্চ চাপের বাষ্পীয় ইঞ্জিন

আবিষ্কার করেন ইংল্যান্ডের
রিচার্ড ট্রেভিথিক
(১৮০০ সালে)

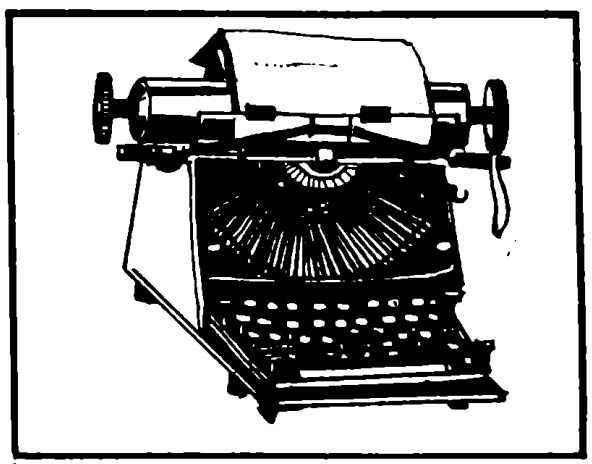

টাইপরাইটার

আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকার
ক্রিস্টোফার এল. শোলস্
(১৮৬৮ সালে)

টেলিফোন

আবিষ্কার করেন আমেরিকার
আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

আবিষ্কারের সাল বলতে পারো?
উত্তর আগামী সংখ্যায়।

শহীদ মিনার ও সপ্তর্ষি মণ্ডল

অরূপরতন ভট্টাচার্য

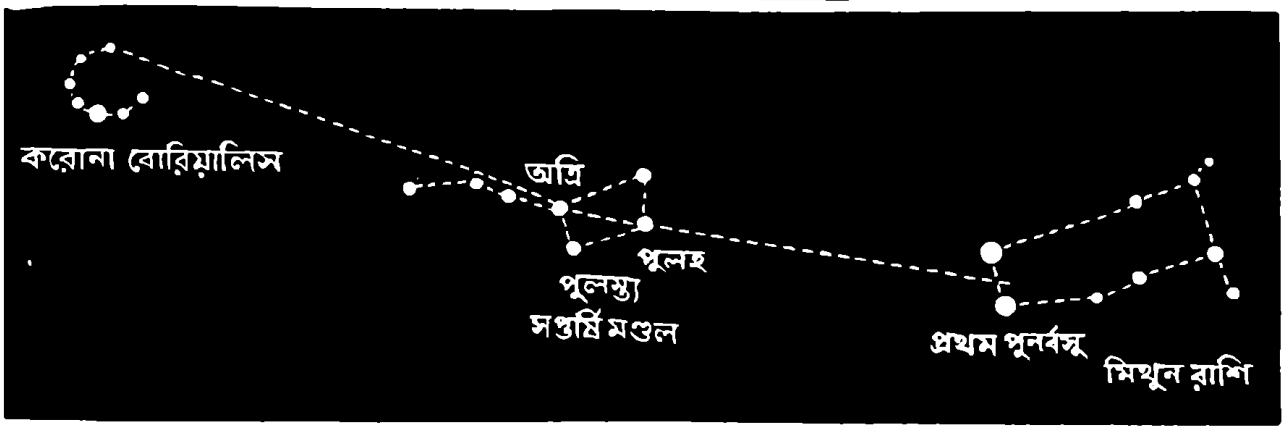

সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলে আদ্যানাথের মেশোর ঠিকানার হদিশ দেওয়া আছে। কিন্তু সে নির্দেশ ধরে বাড়ির আস্তানা খুঁজে বের করা খুব সহজ কাজ বলে কারোরই মনে হবে না।

কি করে হবে?

ঠিকানার জন্যে দুটো জিনিস দরকার। এক, পাড়ার নাম; দুই বাড়ির ঠিকানা। বাড়ির ঠিকানা অবশ্য না হলেও চলে যদি থাকে বাড়ির নাম।

সন্ধানী লোক ঠিক এই ধরে বাড়ি খুঁজে বের করে ফেলবেন।

শুধু আমাদের শহর গঞ্জ সম্পর্কে নয়, মহাকাশের বেলাতেও এই কথা।

মহাকাশে কোনো সোজা অঞ্চল নেই। উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশ সমস্ত পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। নেহাৎ ছোট-খাটো পরিসর নয়। বিরাট, বিস্তীর্ণ লোক। এখানে রাত্রির অন্ধকারে যখন তারারা ফুটে ওঠে, উজ্জ্বল, অল্প উজ্জ্বল, বিচিত্র বর্ণ শোভিত, কোথাও তারা ঘন সন্নিবেশিত, কোথাও তারা আবার বিচ্ছিন্ন বা সঙ্গীবিহীন, তখন তাদের পরিচয়হীন কেবলমাত্র এক একটি তারা মনে করার কোনো কারণ নেই।

কোনো পাড়ার প্রতিটি বাড়ির যেমন এক একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে, তেমনি মহাকাশের এক এক অঞ্চলের তারাদের এক একটা নির্দিষ্ট পরিচয় আছে।

মহাকাশের এই অঞ্চলগুলি ভাগ করা হয় কি ভাবে? কলিকাতা-৩৭ বললে আমরা বুঝি বেলগাছিয়া, কলিকাতা—৯ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১৯ বালিগঞ্জ, কলিকাতা—২৯ বললে সে আবার রাসবিহারী এভিনিউ। বড় বড় শহরকে যেমন বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা হয়, মহাকাশের তারাদের

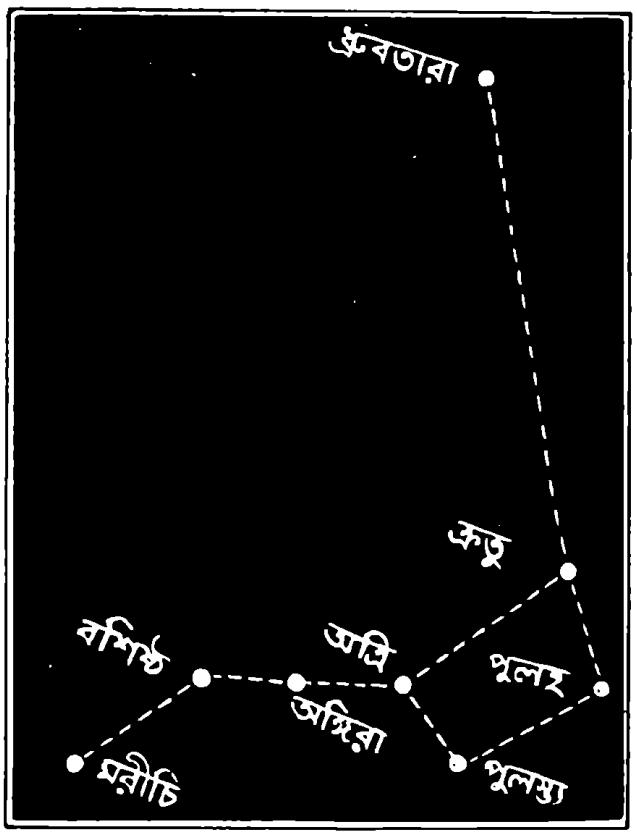

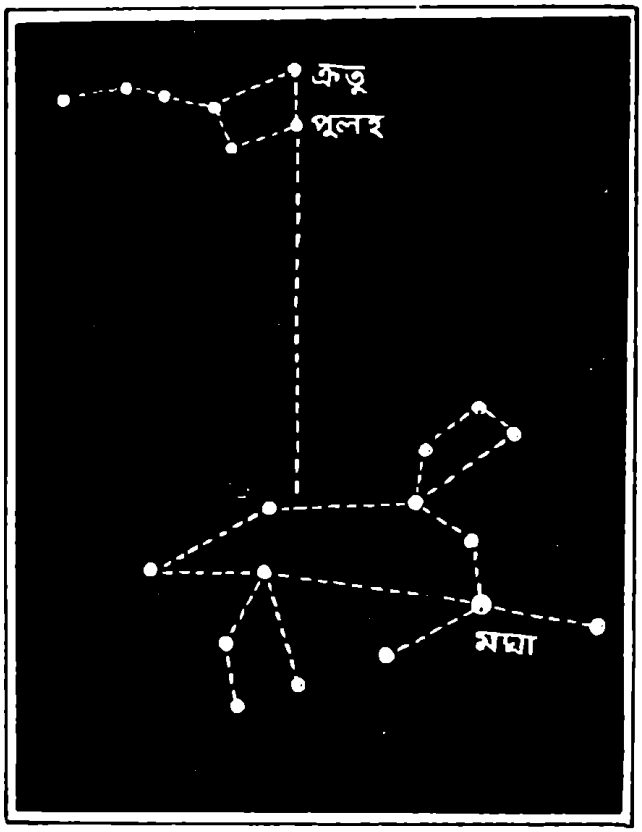

বেলাতেও তেমনি। উত্তর আর দক্ষিণ গোলার্ধ মিলে এ রকম অঞ্চলের সংখ্যা ৮৮। এর মধ্যে উত্তরে আছে ৪৮, দক্ষিণে ৪০।

কিন্তু এই যে ভাগ। এই ভাগের সময়ে কি রীতি অনুসরণ করা হয়? মহাকাশ তো তারায় তারায় একাকার হয়ে আছে। সেখানে শহীদ মিনার নেই, শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের নেতাজীর মূর্তি নেই, বালিগঞ্জের লেক নেই। সেখানে তো কেবলই তারা। এই তারাদের নিয়ে অঞ্চল ভাগ করা খুব সহজ কথা নয়।

প্রাচীনকালের আকাশ পর্যবেক্ষকেরা তারাদের নিয়ে বিভিন্ন মূর্তি কল্পনা করেছেন। সে মূর্তি কোথাও জীব-জন্তুর, কোথাও বা মানব স্ত্রী-পুরুষের। অবশ্য কল্পনা যে সব সময়ে বাস্তবমুখী এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু এই কল্পনার যে অভিনবত্ব আছে তা বিস্ময়কর, মনকে তা খুশি করবেই। আকাশের এক একটি অঞ্চল ভাগ করা হয়েছে এক একটি কল্পনাকে আশ্রয় করে।

দক্ষিণের আকাশে একটি তারকমণ্ডল আছে, নাম বৃশ্চিক। তাতে দেখা যায় ঠিক যেন একটি বৃশ্চিক-উজ্জ্বল, তারায় তারায় চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না। আকাশের দক্ষিণ দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণের আকাশে যেমন বৃশ্চিক, উত্তরের আকাশে তেমনি

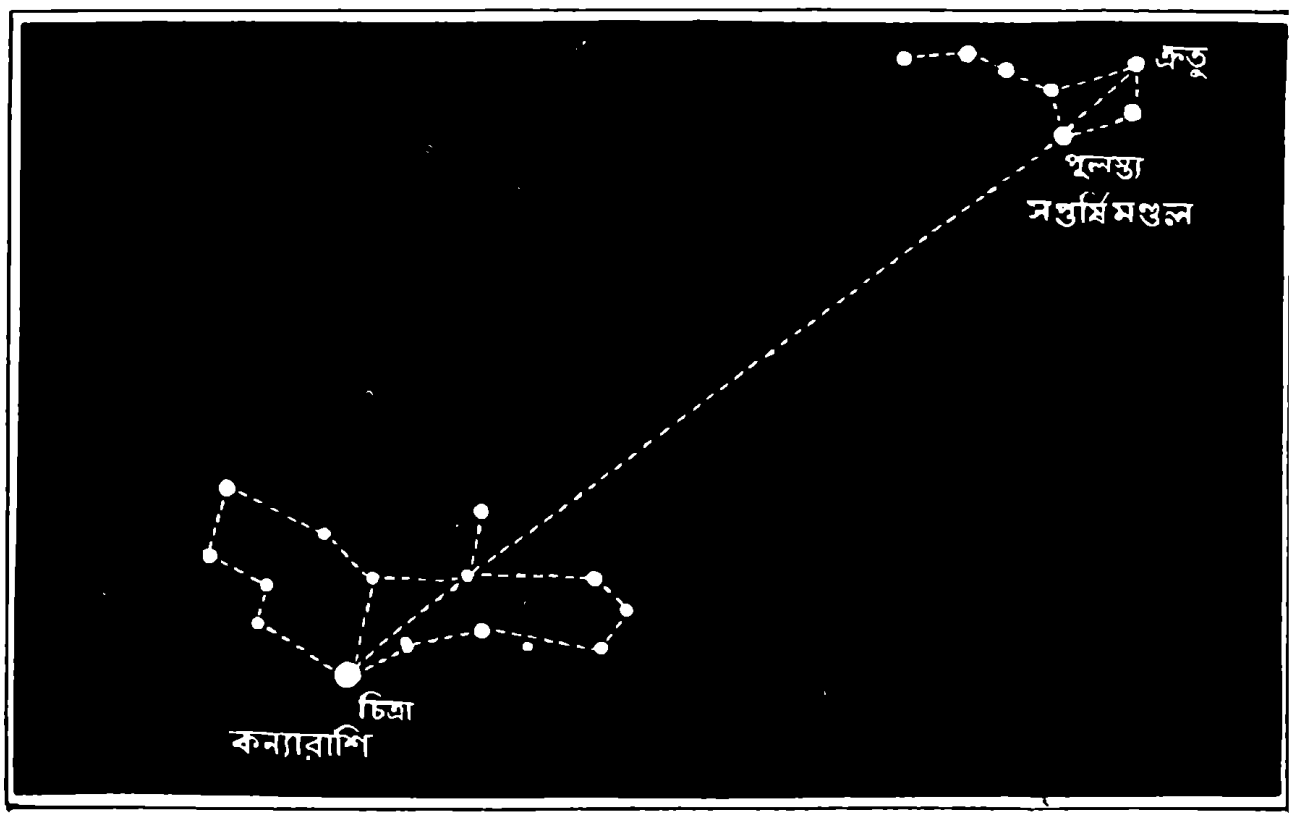

নাম উর্ষা মেজর। না, উর্ষা মেজর বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। কেন না উর্ষা মেজরে সাতটি মাত্র তারকা নেই। তাতে অনুজ্জ্বল আরও তারা মিলে যেন একটি বিরাট আকারের ভালুকের কল্পনা। এর মধ্যে আছে সপ্তর্ষির সাতটি তারা।

পুলহ ও ক্রতুকে উত্তর দিকে বাড়িয়ে দিলে ধ্রুবতারা। যদি তাকে আবার দক্ষিণ দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে যেখানে গিয়ে পৌঁছে যাবো সেখানে দেখবো একটি সিংহের আকৃতি। তাকে চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়। সিংহের আকৃতি সিংহ রাশিকে নির্দেশ করে। এই সিংহ রাশিকে ঘিরে সিংহের অঞ্চলটি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সিংহ রাশির বিদেশী নাম লিও।

আকাশে, আমরা বলি, আছে ৮৮টি তারকামণ্ডলে। কিন্তু এদের মধ্যে আছে ১২টি রাশি। রাশিরাও তারকা-মণ্ডল তবু তাদের তারকামণ্ডল না বলে বলা হয় রাশি। কেন?

কারণ এই রাশিরা আছে বিশেষ একটা পথের উপরে। আমাদের যেমন আছে রাজপথ, মহাকাশেরও সে রকম একটা পথ আছে, যেটাকে মহাকাশের রাজপথ বলা যায়। সূর্যকে মহাকাশে তারকাদের পটভূমিতে এই আপাত পথে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক দিয়ে এক বছরে একটা আবর্তন সম্পূর্ণ করে, আসতে দেখা যায়।

মহাকাশ বা মর্ত্য, যেখানেই হোক, রাজপথের মত পথের কিছু কিছু দর্শনীয় বস্তু থাকবেই। সিংহের আকৃতি নিয়ে ছবিটি আছে মহাকাশে রাজপথের উপরেই।

পুলহ ও ক্রতুর দক্ষিণ গতিপথে পড়ছে সিংহ রাশি। সিংহ রাশিতে আছে একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল তারকা। এটা প্রথম মাত্রার তারকা। এ রকম প্রথম মাত্রার তারকা সংখ্যা মাত্র ২০। এখানে বলে রাখা ভাল যে, আকাশে খালি চোখে যত তারা দেখা যায়, প্রথম মাত্রার তারারা তাদের মধ্যে সকলের উপরে। অর্থাৎ এরা সকলের চেয়ে বেশি দর্শনীয়।

সিংহ রাশির প্রথম মাত্রার তারাটি আছে সিংহের পায়ের কাছে। নাম মঘা। বিদেশী নাম রেগুলাস। এটি প্রথম কুড়িটি তারার মধ্যে সবচেয়ে কম উজ্জ্বল।

যদি আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল থাকে আর মাঝ আকাশে সিংহ রাশি তাহলে সিংহ রাশিকে আর তার সঙ্গে মঘাকে চিনে নেওয়া যাবে সপ্তর্ষি মণ্ডলের পুলহ আর ক্রতুর সাহায্য নিয়ে। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠে সন্ধ্যের অন্ধকারে আকাশে একই সময়ে সপ্তর্ষি মণ্ডলের সঙ্গে সিংহ রাশিকে দেখা যায় মাঝ আকাশে। ক্রতু, পুলহের দক্ষিণের মাত্রা যে তখন সরাসরি সিংহ রাশিতে পৌঁছে যায় বুঝতে তা অসুবিধে হয় না।

সিংহ রাশির পূর্ব দিকে আর একটা রাশি আছে। সিংহের পরের রাশি সেটি, নাম কন্যা। কন্যা রাশিতে দেখা যাবে ঠিক একটা কন্যার আকৃতি। আকাশ পর্যবেক্ষকরা প্রাচীনকালে আকাশের যে নির্দিষ্ট অঞ্চলের তারায় কন্যার মূর্তির কল্পনা করেন, সেই অঞ্চলটিকে কন্যার নামে নির্দিষ্ট রাখেন। ভাবলে অবাক না হয়ে উপায় নেই।

কন্যার বিদেশী নাম ভার্গো। ক্রতু ও পুলস্ত্যকে যোগ করলে যে রেখাটি নেমে আসে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, প্রায় সেই রেখার উপরেই আছে কন্যা রাশির সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা! এর নাম চিত্রা, বিদেশী নাম স্পাইকা। আকাশে প্রথম মাত্রার কুড়িটি উজ্জ্বল তারার মধ্যে এর স্থান ষোড়শ। অর্থাৎ মঘার চেয়ে এর উজ্জ্বলতা কিছুটা বেশি। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে সন্ধ্যের অন্ধকারে সপ্তর্ষি মণ্ডলের সঙ্গেই কন্যা রাশিকে দেখা যায় প্রায় মাঝ আকাশে। তখন সপ্তর্ষিকে ধরে এটিকে চেনা কঠিন নয়।

উত্তর আকাশে একটি দর্শনীয় তারকামণ্ডলের নাম বুটিস। মণ্ডলটিকে সাধারণতঃ একজন শিকারীর বেশে কল্পনা করা হয়। মণ্ডলে একটি প্রথম মাত্রার তারা আছে, অত্যন্ত উজ্জ্বল, নাম আর্কটারাস। আকাশে প্রথম মাত্রার কুড়িটি তারার মধ্যে এর স্থান ষষ্ঠ। তাহলে মঘা বা চিত্রার চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে এর স্থান অনেক উপরে। বাংলায় এটিকে ডাকা হয় স্বাতী বলে। যদি সপ্তর্ষি মণ্ডলের পুলহ ও পুলস্ত্যকে যোগ করে পূর্বদিকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাহলে তা যাবে স্বাতীর গা ঘেঁষে। তা ছাড়া আর্কটারাস, নামের ভেতরেই এর অবস্থানের আর একটা নির্দেশ আছে। উর্ষা মেজর বা বৃহৎ ভালুকের লেজের তিনটি তারা যোগ করলে যে চাপ হয়, আর্কটারাস বা স্বাতী আছে সেই চাপের উপরে। আর্কটারাস শব্দের অর্থও ভালুকের লেজ। নিশ্চয়ই আর্কটারাস যুক্ত ছিল উর্ষা মেজরের লেজের সঙ্গে।

ব্যাপারটা শুনলে কৌতূহল হয় না? বৃহৎ ভল্লুকের লেজের তিনটি তারা আছে সপ্তর্ষির অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ আর আর মরীচিকে নিয়ে। তার সঙ্গে স্বাতী। অর্থাৎ লেজ বৃহৎ। কিন্তু সে বৃহৎ লেজ এখন আর নেই। তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যুক্ত হয়েছে যোদ্ধার সঙ্গে। [এরপর ৫৩ পৃঃ]

□-□□-শব্দছক□□□□□

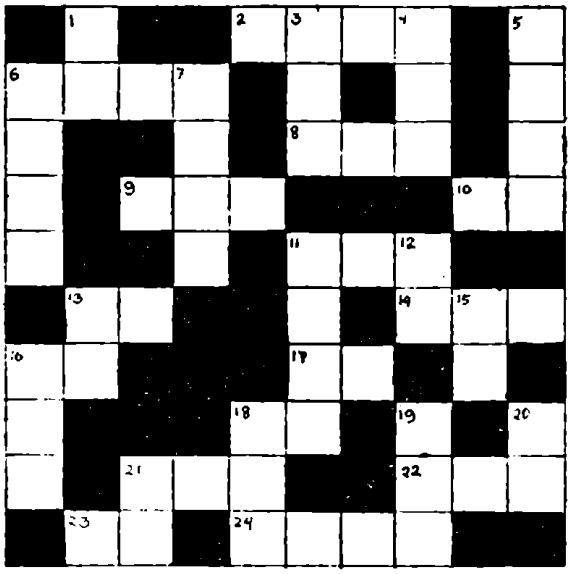

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ—২। বিশ্ববিখ্যাত এক জ্যোতির্বিদ। ৬। 'জীবাশ্ম-কঙ্কাল' ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত এক বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ। ৮। এক ধরণের রশ্মি। ৯। এক প্রকার জ্বালানী। ১০। বস্তুর পরিমাপ। ১১। হ্যালোজেন গোষ্ঠীর এক মৌল। ১৩। এক বিখ্যাত অভিযাত্রী। ১৪। — আলভা এডিসন। ১৬। নোবেল বিজয়ী মহিলা বিজ্ঞানী। ১৭। শর্করা। ১৮। মাপের এক একক। ২১। এক ধরণের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ রশ্মি (উল্টো)। ২২। সোহাগা। ২৩। এক ধরণের তৈল বীজ (উল্টো)। ২৪। 'ফিসন' এর আবিষ্কারক মহিলা বিজ্ঞানী।

উপরে নীচে ঃ—১। —র নিরাপত্তা বাতি। ৩। আধুনিক অ্যান্টি-সেপটিক শল্য চিকিৎসার জনক। ৪। এক মৌল যার সংকেত O। ৫। এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ৬। রুশ বিজ্ঞানী, পিটার—। ৭। এক্স-রশ্মির আবিষ্কারক। ১১। প্রাচীন মতে, দহনের কারণ যে কণা। ১২। জাহাজের গতিবেগের একক। ১৩। নোবেল বিজয়ী এক পরিবার। ১৫। স্কেলার রাশির শুধুমাত্র — আছে। ১৬। বংশগতির সূত্র আবিষ্কারক গ্রেগর জোহান —। ১৮। প্রথম শতাব্দীর এক জ্যোতির্বিদ। ১৯। ত্রি-মাত্রিক ছবির আবিষ্কারক। ২০। কোয়ান্টাম থিওরীর আবিষ্কর্তা, — প্ল্যাঙ্ক। ২১। গ্রহরত্নের ওজনের একক।

শব্দছক □ দেবব্রত রায় চৌধুরী

[৫২ পৃঃ পরের অংশ]

অত্রি আর পুলহকে যোগ করে বাঁয়ে ডাইনে বাড়িয়ে দিলে কি হবে ? বায়ে ডাইনে অর্থাৎ যথাক্রমে পূর্ব পশ্চিমে। পূর্বে সে গিয়ে পৌঁছবে স্বাতী তারাকে নিয়ে বুটিস মণ্ডলের ঠিক উত্তরে, সেখানে আছে করোনা বোরিয়ালিস, অর্ধ গোলাকৃতি, কল্পনায় মুকুটের মতন। আর পশ্চিমে সে নির্দেশ করবে মিথুন রাশিকে। মিথুন রাশির বিদেশী নাম জেমিনি। এই মিথুন রাশিতে দুটি খুব উজ্জ্বল তারা আছে। একটির নাম পোলাক্স, অন্যটি ক্যাস্টর। বাংলায় পোলাকস প্রথম পুনর্বসু, ক্যাসটর দ্বিতীয় পুনর্বসু। প্রথম পুনর্বসু আকাশের পঞ্চদশ উজ্জ্বল তারকা। দ্বিতীয় পুনর্বসু দ্বিতীয় মাত্রার, কিন্তু প্রথম পুনর্বসুর মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছবে।

আকাশের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে সবচেয়ে আগে দরকার তেমন দর্শনীয় কিছুর সঙ্গে একটা খুঁটি বেঁধে নেওয়া। কলকাতার শহীদ মিনারকে যেমন খুঁটি বলা যায়, তেমনি আকাশের উত্তরে সপ্তর্ষি মণ্ডলও।

খুঁটি বাঁধার মত তারকামণ্ডল আকাশপটে বেশী নেই। কিন্তু যা আছে তা যথেষ্ট। কালপুরুষ, বৃশ্চিককে এরকম খুঁটি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সব খুঁটির জোর কম নয়। তাদের সামনে রেখে আকাশপটে বিভিন্ন তারকামণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া চলে।

শুধু খেয়াল রাখা দরকার, শহরের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের সঙ্গে মহাকাশের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম মেলে না। মেলানোর জন্যে তারকাপটকে মাথার উপরে নীচের দিকে ক'রে ধ'রে উত্তর-দক্ষিণ মেলালেই দেখা যাবে, পূর্ব-পশ্চিম মিলে গেছে আপনা থেকেই।

[কলকাতায় প্রচণ্ড তুষারপাত ঃ ১০ পৃঃ পরের অংশ]

অনু তাই শুনে তারের কোটের কলার দিয়ে কান ঢেকে বলল, 'প্রচণ্ড স্নোফল হচ্ছে চারদিকে, আপনার কিন্তু ধাক্কা লাগানো একেবারেই উচিত হবে না। আচ্ছা, আপনার ল্যাবরেটরিতে একটা ফায়ারপ্লেস বানিয়ে নিন না। ঘরটা সব সময় বেশ গরম থাকবে।'

জ্যাঠামশাই গলা ফাটিয়ে হা-হা করে হেসে বললেন, 'তা তুমি মন্দ পরামর্শ দাওনি।'

জ্যাঠামশাইয়ের হাসি আর কথায় রীতিমত লজ্জা পেয়ে গেল অনু। সারা পৃথিবীর আবহাওয়া যিনি একেবারে ওলটপালট করে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে উপদেশের ঢঙে কথা বলা উচিত হয়নি ওর।

বিকেলবেলায় বাড়ি ফেরার মুখে জ্যাঠামশাই গলা নামিয়ে বললেন, 'আমার কাণ্ডটার কথা তুমি কাউকে কিন্তু ভুলেও বলে ফেল না। সবকিছু এখন আমি গোপন রাখতে চাই। নিরিবিলিতে বসে পৃথিবীর সব জায়গায় আবহাওয়া আমি এখন স্টাডি করব, তারপর কয়েকদিন বাদে না হয়—।'

খবরটা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনু যখন বিকেল চারটে নাগাদ জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি থেকে বেরুল তখন আবার ঝিরঝির করে তুষার পড়া শুরু হয়েছে। সঙ্গে কনকনে হাওয়া। রাস্তায় লোকজন, গাড়িঘোড়ার সংখ্যা কমে গেছে একদম। বাসস্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পরে বাস পেল অনু। বাসটা হেডলাইট জেবলে কচ্ছপের গতিতে এগোতে লাগল সামনের দিকে।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ হাতে পেয়ে কলকাতার লোকদের উত্তেজনা চরমে উঠল। উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আবহাওয়া দেখা দিয়েছে হঠাৎ। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যাণ্ড আর রাশিয়ার কিয়েভ-সংলগ্ন এলাকার মানুষ এই নভেম্বরেও গরমে ছটফট করছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ভয়াবহ আশ্বিক রোগ দেখা দিয়েছে লণ্ডন, প্যারিস আর ফ্রাঙ্কফুর্টে। কাক আর চড়ুই পাখির উৎপাত অস্বাভাবিক পরিমাণে বেড়ে গেছে শহরের রাস্তায়-রাস্তায়। শহরগুলির কয়েকটি বিখ্যাত নাইটক্লাব জমজমাট অনুষ্ঠানসূচি বাতিল করে বক্তৃতার আয়োজন করেছে। বক্তৃতার বিষয় হল ঃ পরিবর্তিত আবহাওয়ায় সুস্থ হয়ে বাঁচার পথ। বক্তাদের প্রায় সবাই-হয় ভারতীয় নয় বাংলাদেশী। তাঁরা দই, ঘোল, বেলের মোরব্বা, কাঁচকলার ঝোল ইত্যাদি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন সাহেবদের।

এদিকে, ওই সব দেশের আবহাওয়া এখন দেখা দিয়েছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বর্মা, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান এবং চীনে। এইসব দেশের কোথাও কোথাও শীত-প্রধান দেশের ধাঁচে বাড়িঘর বানাবার উদ্যোগ দেখা দিয়েছে। কারণ, অত্যধিক তুষারপাতে টেবিল-আকৃতির ছাত ধসে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

এই আশঙ্কার খবরটা পড়ার পরেই অনু ছুটে ওদের ছাতে উঠল। ছাতের কোথাও কোথাও পাতলা তুষার জমে ছিল, ও বেলচা দিয়ে বরফগুলো তুলে নিয়ে ফেলে দিল গলির মধ্যে। তারপর নীচে নামতেই শুনতে পেল টুনটুনি কান্না জুড়েছে তারস্বরে। কী ব্যাপার?

মা টুনটুনির গালে কোল্ডক্রিম ঘসতে ঘসতে বললেন, 'আদিখ্যেতা! গাল ফেটেছে বলে কান্না জুড়েছেন উনি।'

আর একটু কাছে এগিয়ে এসে অবাক হয়ে গেল অনু। 'ওমা! টুনটুনির গাল দুটো কী রকম লাল হয়ে গেছে দেখ।'

টুনটুনির গায়ের রঙ এমনিতেই ফর্সা, কিন্তু গালের রঙ এ রকম লাল ছিল না তো আগে!

বেশ খুঁটিয়ে মেয়ের মুখটা দেখে নিয়ে অনুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, 'তোমার মেয়ে এখন মেম-সাহেবদের মতো ফর্সা হতে শুরু করেছে। হবে নাই বা কেন, তোমাদের দেশটা তো এখন সাহেব মেমদের দেশ হয়ে গেছে।'

'সত্যি!' অবাক হয়ে গেল শ্রোতাদের তিনজনেই।

অনুর মাথার মধ্যে একগাদা প্রশ্ন কিলবিল করে উঠল, কিন্তু প্রশ্নগুলো করার সময় নেই একদম, স্কুলে ছুটতে হবে এক্ষুণি।

কলকাতায় বরফ পড়া শুরু হওয়ার পর থেকেই স্কুলের সময়টা পালটে গেছে। স্কুল ছুটি হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। শোনা যাচ্ছে, এবার থেকে স্কুলে গরমের ছুটির বদলে শীতের ছুটি দেওয়া হবে। টানা তিনমাসের ছুটি। সেই ছুটি শুরু হবে শিগ্‌গিরই।

অন্যান্য বছর এই সময় স্কুলের টিফিন আওয়ার্সে ক্রিকেট খেলত অনুরা, কিন্তু এখন আর ক্রিকেট খেলার উপায় নেই। বরফ পড়ে সাদা হয়ে থাকে স্কুলের মাঠটা। সেই মাঠে কেউ কেউ এখন রোলার-স্কেটিং করে, কেউ কেউ ছোড়াছুড়ি করে বরফের বল, কেউ কেউ আবার মাটির মতো হালকা বরফ ছেলে স্নোম্যান বানায়।

আজ স্কুল ছুটি হতেই অনু ছুটল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে। জ্যাঠামশাই তাঁর গবেষণাগারে বসে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে কী যেন পরীক্ষা করছিলেন মন দিয়ে। অনু জ্যাঠামশাইর দিকে তাকিয়েই বলল, 'জ্যাঠামশাই, তুমি আরো ফর্সা হয়ে গেছ।'

জ্যাঠামশাই ওর কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে অনুবীক্ষণ যন্ত্র থেকে চোখ তুলে প্রশান্ত মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যা, কী বলছিলে তুমি?'

'বলছিলাম কি, তোমার গায়ের রঙ আগের চেয়েও বেশি ফর্সা হয়ে গেছে।'

জ্যাঠামশাইয়ের মুখে সুন্দর একটা হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'তাই তো হবে এবার থেকে। শীতের দেশের মানুষদের গায়ের রঙ তো সাদা হয়।'

সকালবেলায় বাবার মুখে এই ধরণের কথা অনুর মধ্যে যে বিস্ময়বোধটা তৈরি হয়েছিল সেটা ইতিমধ্যে বহু গুণ বেড়ে গেছে। ও চোখ বড়-বড় করে বলল, 'এ-দেশের সবাই এবার ফর্সা হয়ে যাবে? সাহেবদের মতো ফর্সা?'

'নিশ্চয়ই। তবে রাতারাতি হবে না। অনেক সময় লাগবে। আমরা এখন শীতপ্রধান দেশের মানুষ না?'

অনুর বড়-বড় চোখে পলক পড়ছিল না একবারও। ঢোঁক গিলে বলল, 'আচ্ছা, এখন যারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ হয়ে গেল—মানে সাহেবরা, ওদের গায়ের রঙ কি সাদাই থাকবে?'

'না, কক্ষনো না। আমরা যে হারে সাদা হব এরা ঠিক সেই হারে কালো হবে। একটা সময় আমরা হব সাদা মানুষ, ওরা হবে কালো মানুষ।'

উত্তেজনায় চোখ-মুখ প্রায় লাল হয়ে উঠেছিল অনুর। ও দু-হাত মুঠো করে বলল, 'ওহ! দারুণ ব্যাপার হবে।'

জ্যাঠামশাই ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'গায়ের রঙ নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বলো তো! আমি তো সাদার চাইতে কালো রঙ ঢের বেশি পছন্দ করি। তুমি কালো রঙ পছন্দ করো না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও কালো রঙ খুব ভালবাসি।' সামান্য ইতস্ততঃ করে উত্তর দিল অনু।

মনোমত উত্তর পাওয়ার পরেও জ্যাঠামশাই চেপে ধরলেন ওকে।' তাই যদি হবে তাহলে আমাদের গায়ের রঙ সাহেবদের মতো হবে শুনে তুমি ওভাবে লাফিয়ে উঠেছিলে কেন?'

অনু লজ্জা পেয়ে বলল, 'নানা, ওটা আমি অন্য কথা ভেবে বলেছিলাম।'

'কী কথা?'

অনু লজ্জায় মুখ লুকিয়ে উত্তর দিল, 'নানা ও কিছু না।'

কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে এত সহজে ছাড় পাওয়া যায় না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উনি আসল কথাটা বলতে বাধ্য করলেন অনুকে।

অনু এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও কিছুটা ঘেমে উঠে মেঝের দিকে চোখ রেখে বলল, 'শুনেছি, আমাদের দেশে কালো মেয়েদের বিয়ে হতে চায় না সহজে, তা সবাই ফর্সা হয়ে গেলে—।'

অনুর কথাটা শেষ হওয়ার আগেই হা-হা করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন জ্যাঠামশাই। হাসি আর থামতেই চায় না, আমার মুখে আবার নতুন করে হেসে ওঠেন। শেষে কোনোমতে হাসি থামিয়ে বললেন, 'মিস্টার অনমিত্র সেন দেখছি—যাকে বলে খুব সমাজ-সচেতন ছেলে। ভাল ভাল, তা লুকিয়ে লুকিয়ে একটু-আধটু বড়দের গল্পের বই পড়া হয়, তাই না?'

অনু দুদিকে মাথা ঝাঁকাল খুব জোরে।

জ্যাঠামশাই হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, ওয়ার্ল্ড নিউজ বুলেটিন শুনে নিই একবার।'

জ্যাঠামশাইয়ের নিজের হাতে বানানো অদ্ভুত চেহারার একটা রেডিও সেট আছে, সেটায় নাকি পৃথিবীর যেকোনো সেন্টার ধরা পড়ে। রেডিওর সঙ্গে লাগানো হেডফোনটা পরে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন গম্ভীর মুখে, তারপর একসময় লাফিয়ে উঠে বললেন, 'এই খবরটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ ধরে।'

'কী খবর? কী খবর?' অদ্ভুত এক উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অনুও।

নিজের খেয়ালে জ্যাঠামশাই লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে লাগলেন, 'দি ফ্রোজেন এরিয়া উইদিন আর্কটিক অ্যান্ড অ্যান্টার্টিক সার্কল স্টার্টস মেল্টিং!'

জ্যাঠামশাইয়ের উচ্ছ্বাস এবং কথাগুলোর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না অনু। জ্যাঠামশাই একটু ঠান্ডা হওয়ার পরে ও বেশ জোর গলায় বলল, 'কী খবর? কী হয়েছে? বলবে তো?'

জ্যাঠামশাই হেডফোনটা খুলে রেডিওর পাশে রেখে

দিয়ে বললেন, 'এই খবরটার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম।'

'কী খবর?'

খবরটা শোনার আনন্দে জ্যাঠামশাই বোধহয় অনুর কথা ভুলেই গিয়েছিলেন, এবার ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছিলে তুমি?'

অনুর কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, ও কোনো-রকমে বলল, 'আরে, যে খবরটা শুনে তুমি এত হৈ-হৈ করছ, সেই খবরটা কী বলবে তো?'

জ্যাঠামশাই মুচকি হেসে বললেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হয়ো না। যে খবর শোনার জন্যে তুমি সারা জীবন ধরে অপেক্ষা করেছিলাম সেই খবরটার জন্যে তুমি এক মিনিটও ধৈর্য ধরতে পারছ না!'

বেশ আয়েস করে একটা চুরুট ধরিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, 'পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ মেরু আছে, জানো তো?'

অনু একদিকে নত করল মাথা।

'বেশ। এই দুটি মেরু-অঞ্চল সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে, কারণ সূর্যের আলো ওই দুটি এলাকায় ধরতে গেলে পৌঁছয়ই না, জানো তো?'

এইরকম সাদামাটা প্রশ্ন করে বারবার 'জানো তো' বললে একটু উঁচু ক্লাসের যে-কোনো ছাত্রেরই রাগ হয়ে যাওয়ার কথা। অনুরও রাগ হল, কিন্তু আসল ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শোনার জন্যে ও রাগ গোপন করে আবারও মাথা নত করল একপাশে!

একটু থেমে জ্যাঠামশাই বলতে শুরু করলেন আবার। 'পৃথিবীর অবস্থান পালটে যাওয়ার জন্যে এই দুটি এলাকার ওপর এখন সরাসরি সূর্যের আলো পড়তে শুরু করেছে এখন। তার ফলে চিরতুষার অঞ্চল গলতে আরম্ভ করেছে।'

উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর বরফ গলার খবরে হৈ-চৈ করার মতো কিছুই খুঁজে পেল না অনু। ও দু-হাত উলটে বলল, 'ওসব জায়গায় বরফ গলছে তো আমাদের কী?'

জ্যাঠামশাই ওর দিকে অবাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকার পরে বললেন, 'কী বলছ তুমি! বরফ গলছে তো আমাদের কী! মেরু-অঞ্চলের বরফ গলে গেলে আমাদের সামনে বিশাল একটা জগৎ খুলে যাবে।'

জ্যাঠামশাইয়ের কথাটার আসল অর্থ এখনও স্পষ্ট হল না অনুর কাছে।

চুরুটে তেমন ছাই জমেনি, কিন্তু জ্যাঠামশাই অস্থিরভাবে অ্যাশট্রের ওপর বারকয়েক চুরুটটা ঠুকে বললেন, 'কিছুকাল আগে ব্রিটেন আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মধ্যেকার নর্থ সীর বেড খুঁড়ে বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে—সে খবরটা জানো তুমি?'

অনু দুপাশে মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিল, খবরটা সে জানে না। তার মাথা নাড়াবার ভঙ্গি দেখে এটাও বোঝা গেল যে, খবরটা না জানার জন্যে সে একটুও লজ্জিত নয়।

অমনোযোগী ছাত্রকে পুরো ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে জ্যাঠামশাই এবার উঠে-পড়ে লাগলেন। 'তুমি তো জানো দক্ষিণ মেরু আসত একটা মহাদেশ। উত্তর মেরু এলাকাটাও বিশাল। অথচ এই দুটো মেরু চিরকাল বরফে ঢাকা থাকে। মেরুর রহস্য জানার জন্য কত অভিযাত্রী মেরু-অঞ্চলে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন, অথচ আজ পর্যন্ত কিছুই তেমন জানা যায়নি। এই দুটি মেরুর বরফ গলে গেলে বিশাল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের হাতে এসে যাবে। তেল, কয়লা, লোহা, তামা, সোনা ইত্যাদি কত কিছু মজুত আছে ওই দুটো এলাকার মাটির নীচে। সেসব হাতে এলে পৃথিবীর মানুষ বহু বছর আরামে জীবন কাটাতে পারবে। এবার বলো, মরু এলাকার বরফ গলে যাবার মতো চমকপ্রদ খবর আর কী থাকতে পারে?'

জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে ভবিষ্যত পৃথিবীর আশ্চর্যজনক এক চেহারা অনুর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ও এবার লাফিয়ে ওঠে বলল, 'সত্যি, দারুণ খবর!'

কিন্তু এই দারুণ খবরের পরিণতি যে কতখানি মর্মান্তিক হতে পারে সেটা জানা গেল পরদিন সকালে।

খবরের কাগজে চোখ রাখার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল গোটা কলকাতার লোক। তবে এই আতঙ্ক শুধু কলকাতার নয়, সারা পৃথিবীর। বিশেষ করে পৃথিবীর দুটি প্রান্তের।

মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে প্রবল গতিতে। তার ফলে পৃথিবীর দুটি মহাদেশে মহাপ্রলয় আসন্ন। মহাদেশ দুটি ধীরে ধীরে বরফগলা জলে ডুবে যাবে। তারপর এই দুটি এলাকায় গড়ে উঠবে নতুন মেরু অঞ্চল—চিরতুষারে দেশ।

তীব্র জলস্রোত গ্রাস করতে চলেছে অস্ট্রেলেশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর ইউরোপের বেশ কিছু দেশকে। হাহাকার পড়ে গেছে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ; ব্রাজিল, বলিভিয়া, পেরু আর্জেন্টিনা ইত্যাদি দেশের মানুষদের আর্ত-চিৎকার আর কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে ; গ্রীনল্যান্ড, সাইবেরিয়া, লেলিনগ্রাদ, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি এলাকার মানুষরা প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে মধ্য ইউরোপ আর এশিয়ার দিকে। ত্রাণকার্য চলছে সর্বত্র, কিন্তু এই মহাপ্রলয়কে সামলাবার পক্ষে সে কাজ ধরতে গেলে কিছুই নয়।

মহাপ্রলয়ে কলকাতার মানুষদের কোনো বিপদ হবে না, কিন্তু অজানা এক আতঙ্কে তারাও শিউরে উঠেছিল।

খুব দ্রুত খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে অনু ছুটল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে। জ্যাঠামশাইয়ের ল্যাবরেটরিটা কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, মধ্যিখানে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন জ্যাঠামশাই। অনুকে দেখেই সম্পূর্ণ ভেঙে-পড়া মানুষের ভঙ্গিতে তিনি বললেন, ' আমি পারলাম না অনু, পারলাম না ?'

'কী পারলে না ?'

উত্তরে খসখসে গলায় জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমার গবেষণার একটা স্টেজ নিখুঁতভাবে কাজ করেছে, কিন্তু আর একটা স্টেজ একেবারেই কাজ করল না ?'

'কী সেটা ?'

প্রশ্ন করার অনেক পরে উত্তর দিলেন জ্যাঠামশাই। 'আমি জানতাম পৃথিবী-গ্রহের অবস্থান পালটালে উত্তর মেরুর সব বরফ গলে যাবে। আবার এও জানতাম, এই বরফগলা জলে পৃথিবীর অপর দুই প্রান্তে নতুন করে দুটো মেরু-অঞ্চল গড়ে উঠবে। সুতরাং আমার গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায় ছিল। মেরু অঞ্চলের সব বরফগলা জল কৃত্রিম উপায়ে বাষ্পে রূপান্তরিত করে মহাশূন্যে মিলিয়ে দেওয়া। সে কাজ আমি করতে পারিনি অনু, আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।'

উত্তেজিত হয়ে অনু বলল, 'তোমাকে পারতেই হবে, জানো তো পৃথিবীতে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে।'

'জানি।' এত ঠাণ্ডা গলায় জ্যাঠামশাই কথাটা বললেন যে, শুনলে পরে যে-কারও মনে হবে—ভয়ানক এই পরিণতির কথা তিনি অনেক আগে থেকেই জানতেন।

অসম্ভব ঠাণ্ডা গলার উত্তর শুনে অনুর উত্তেজনা আরো বেড়ে গেল। থমথমে মুখে ও বলল, 'সব জেনে-শুনেও তুমি চুপ করে আছো, তোমাকে এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'কী করে নেব, আমার আবিষ্কার আর কাজ করছে না।'

'তুমি চেষ্টা করে যাও।'

'এ এক-আধদিনের ব্যাপার নয়, বাকি জীবনটা আমি চেষ্টা করে যাব—কিন্তু তাতেও সফল হব কি না কে জানে ! হয়ত ভবিষ্যতের কোনো বিজ্ঞানী এসে বাকি কাজ শেষ করবেন।'

উত্তেজনার চোটে অনুর মুখে প্রথমে কোনো কথা জোগাল না, তারপর ও কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'কিন্তু একটা কোনো উপায় তোমাকে বার করতেই হবে। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এভাবে জলে ডুবে মরতে পারে না।'

'কিন্তু আমি কী করতে পারি !'

'তুমি পারো।'

দুদিকে জোরে মাথা কাঁপাতে কাঁপাতে চেঁচিয়ে উঠলেন জ্যাঠামশাই—'না আমি পারি না, পারি না, পারি না।'

বাইরে ঝিরঝির করে বরফ পড়ছিল, দমকা হাওয়ায় কনকনে ঠাণ্ডা মাঝেমধ্যে ঢুকে পড়ছিল ঘরের মধ্যে, কিন্তু অনুর একটুও শীত করছিল না। ও ছেলেবেলায় একবার আসামের বন্যা দেখেছে, সেই বন্যার ভয়ংকর চেহারা ওর চোখের সামনে ভাসছিল, আর খ্যাপা জলস্রোতের উৎকট গোঁ-গোঁ শব্দ সমানে আছড়ে পড়ছিল ওর কানের ওপর। সামান্য একটা বন্যার চেহারাই যদি এই হয়, মহাপ্রলয় না জানি কী ভয়ংকর ! বরফগলা জলের সমুদ্রে দেশের পর দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠল অনু, তারপর জ্যাঠা-মশাইকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'পৃথিবী-গ্রহের অবস্থান তুমি তাহলে আগের জায়গায় নিয়ে যাও। কোটি-কোটি মানুষকে এভাবে মেরে ফেলার কোনো অধিকার তোমার নেই।' গলার শিরা ফুলিয়ে কথাগুলো বলার পরেই ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল অনু।

সে রাত্রে আর একটা ভূমিকম্প হল কলকাতায়, এটাও মৃদু। কোথাও কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, তবে মানুষজন ভীষণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। পৃথিবীর একপ্রান্তে মহাপ্রলয় চলছে, তার ওপর আবার এই ভূমিকম্প। পৃথিবীর শেষ দিন কি ঘনিয়ে এসেছে তাহলে !

কলকাতায় বরফপড়া শুরু হওয়ার পর থেকে এই শহরের

জীবনযাত্রা আমূল পালটে গিয়েছিল। কলকাতার ঘরে ঘরে এখন ফায়ারপ্লেস। সন্ধে হতে না হতেই অধিকাংশ বাড়ির জানলা দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন শেষ রাতে শহরের ঘুমন্ত মানুষদের দম প্রায় বন্ধ হঠাৎ। ফায়ারপ্লেস থাকার ফলে ঘরের মধ্যে অস্বাভাবিক গরম। লাফিয়ে উঠে ঘরের জানলাগুলো সবাই খুলে দিল একটানে। তারপরেই অবাক করা দৃশ্য! কোথাও একবিন্দুও তুষার পড়ছে না, কুয়াশারও চিহ্ন নেই, আকাশে মস্ত হলুদ চাঁদ। এ তো সেই পুরনো কলকাতার আবহাওয়া! চুপচাপ করে ঘরের ফায়াপ্লেসগুলো নিবিয়ে দিল সবাই।

সকালের চেহারাটাও পুরনো কলকাতার মতো। কোথাও এককুচিও বরফ জমে নেই। নভেম্বরের কলকাতায় বরাবর যেমন হালকা শীত থাকে ঠিক সেই রকমের শীত সর্বত্র। বরফপড়া শহরটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে হঠাৎ!

সকালের খবরের কাগজে বিস্ময়ের পরে বিস্ময়। পৃথিবীর আবহাওয়া আবার আগের মতো হয়ে গেছে। মহাপ্রলয়ের সংকট থেকে পৃথিবী মুক্ত। মেরু অঞ্চলের বরফগলা বন্ধ হয়ে গেছে একদম। পৃথিবীর ইকুয়েটর ও ট্রপিক অব ক্যানসার আর ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্ন আবার ফিরে এসেছে আগের জায়গায়। তার ফলে সব দেশেই এখন আবার আগের মতো আবহাওয়া। পৃথিবীর বিখ্যাত আবহবিদ্‌রা বিস্তর মাথা ঘামিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন: আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের মূলে ছিল নিছক প্রাকৃতিক খেয়াল।

শেষের খবরটায় চোখ পড়তেই বাঁকা একটা হাসি খেলে গেল অনুর মুখে। ও ছুটল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে।

তছনছ করা গবেষণাগারের মধ্যে জ্যাঠামশাই কেমন যেন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে ছিলেন। চোখ মুখ একেবারে ফ্যাকাশে। অনুকে দেখেই উনি বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলার কোনো অধিকার আমার নেই। আমি তাই— আমি তাই পৃথিবীর আবহাওয়া আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে এনেছি।'

কৃতজ্ঞতায় অনুর গলার ভেতরটা এত ভার-ভার হয়ে উঠেছিল যে, ও চট করে কোনো উত্তর দিতে পারল না। জ্যাঠামশাইয়ের ঠাণ্ডা হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর ঢোঁক গিলে বলল, 'আমি জানতাম। কাল রাত্তিরে ভূমিকম্প হওয়ার সময়ই টের পেয়েছিলাম তুমি আবার—।'

জ্যাঠামশাই এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না। একটু বাদে অনু বলল, 'তুমি একদম মন খারাপ করবে না। তোমার মতো বিজ্ঞানী পৃথিবীতে আর একজনও নেই। তুমি তোমার গবেষণা চালিয়ে যাও। তোমার কাজে সারা পৃথিবীর লোকের ভীষণ উপকার হবে। তুমি—।'

এ কথাটারও কোনো উত্তর দিলেন না জ্যাঠামশাই। ঠিক আগের ভঙ্গিতেই বসে থাকলেন উনি। চোখ মুখ আগের মতোই ফ্যাকাশে।

গবেষণাগারের বড় বড় জানলাগুলো খোলা। শীতের মিঠে রোদ খোলা জানলা দিয়ে মেঝের ওপর এসে পড়েছিল। জানলার বাইরে ঝকঝকে নীল আকাশ। সে দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে ঝলমলে গলায় অনু বলল, 'আমাদের এই কলকাতাই ঢের ভাল।' তারপর কী যেন মনে পড়ে যেতেই হৈ হৈ করে উঠল: 'ওহ্! আজ কত তারিখ? তেইশ, না? তার মানে আজ থেকে ঠিক এগারো দিন বাদে ব্রাজিল তার পুরো টিম নিয়ে কলকাতায় খেলতে আসছে। ভাগ্যিস, মহাপ্রলয়ে ব্রাজিল ভেসে যায়নি! ও জ্যাঠামশাই, তুমি খেলা দেখতে যাবে না? যাবো তো?'

জ্যাঠামশাই এবারও কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু মুখ খোলাবার জন্যে ওঁর হাত ধরে ঝুলোঝুলি শুরু করে দিল অনু। 'কী? যাবে তো? যাবে না? তুমি তো কালো মানুষদের খুব ভালবাস। যাবে তো ওদের খেলা দেখতে? যাবে না? কথা বলছ না কেন? যাবে তো?'

শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল জ্যাঠামশাইকে। মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ যাব।'

ছবি □ সুশান্ত বিশ্বাস

বিজ্ঞানের ভেলকি

চোখের নিমেষে যোগ ঃ

বিদ্যুত ঝলকের মত এই যোগটি করা যায় যদি তুমি গোপন ভেল্‌কিটা জানো ঃ
কাউকে তুমি পাঁচ অক্ষরের একটি সংখ্যা লিখতে বললে। তারপর তুমি তার নীচে পাঁচ অক্ষরের আর একটি সংখ্যা নিমেষে লেখো। আসলে তুমি এমন সংখ্যাই লিখবে যাতে ওপরের প্রত্যেকটি সংখ্যার সঙ্গে নীচের সংখ্যা যোগ করলে যেন ৯ হয়। ধরো সে লিখলো ঃ ৪১৬২৩

তুমি লিখবে ঃ ৫৪৩৭৬

তোমার বন্ধুকে এবার তোমার সংখ্যাটির নীচে আর একটি পাঁচ অক্ষরের সংখ্যা লিখতে বলো। তারপর তার তলায় তুমি চতুর্থ সংখ্যাটি লেখো। ঠিক আগের মতো ৯ এর সূত্র অবলম্বনে। এবার পঞ্চম সংখ্যাটি লিখতে বলো। সংখ্যাটি লেখা হলে তার তলায় লাইন টেনে মুহূর্তে যোগফলটি লিখে ফেলো। লিখবে বাঁদিক থেকে ডান দিকে।

কেমন করে যোগটা করবে ? পঞ্চম সংখ্যাটি থেকে ২ বিয়োগ কর। এবং বাকী সংখ্যাগুলোর পরিবর্তন না করে বাঁদিকে ২ বেশী লিখবে। অর্থাৎ তার পঞ্চম সংখ্যাটি যদি ৪৮৭৬৫ হয় তাহলে যোগফল হবে ২৪৮৭৬৩।

Kishore Vismoi July'84 Rs. 2·50 De. No.37/84

ছোটদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি আশ্চর্য পত্রিকা

কিশোর বিস্ময়

পূজা সংখ্যায়

৫ টি উপন্যাস লিখছেন

**সমরেশ মজুমদার ◉ অদ্রীশ বর্ধন ◉ সিদ্ধার্থ ঘোষ
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ**

আর জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন সব রচনা ও কান্ডকারখানা যা অন্য কোন পত্রিকায় পাবেই না। পূর্নাঙ্গ সূচীর জন্য ধৈর্য্য ধরো•••খবরের কাগজের পাতায়•••